ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

৩ এপ্রিল ২০১৯

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
তাসলিমা আক্তার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
কুমার বিশ্বজিৎ দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

মাঠ পর্যায়ে তত্ত্বাবধান
জাফর সাদেক চৌধুরী, মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মো. আলী হোসেন, মো. খোরশেদ আলম, মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ, মো. গোলাম মোস্তফা

তথ্য সংগ্রহকারী
সাগর মুখার্জী, মো. মমিন ভূঁইয়া, মোছা. ছাবেতুন নেছা, মোশাররফ হোসেন, মো. হাবিবুল্লাহ হায়দার, এ কে এম নাঈম, জোবেদা আক্তার, মো. মঈন উদ্দীন, মো. রিপন মিয়া, মো. নাসির উদ্দিন লিংকন, মো. সোহেল রানা সুইট, মিতু আক্তার, রায়হান এইচ মিল্টন, মো. রেজাউল মোল্লা, মো. সালমান, প্রজীব হালদার, মো. মনিরুল ইসলাম, মো. জেনাউর রহমান সাঈদ, সুবোধ চন্দ্র দাস, মো. ইকবাল হোসেন, মাহমুদুল হাসান, কে. এম. জহিরুল ইসলাম, রবিউল হোসেন, আরিফুর রহমান, শুভ কুমার বিশ্বাস, জ্যোতির্ময় রায়, মো. মেহেদী হাসান, মুহসিনা মেহনাজ, রেখা আক্তার, গাজী সালাউদ্দিন, নাজিয়া আরেফিন, মো. এনামুল হক, মো. আব্দুল গাফফার, ইন্দ্রজিত কুমার রাজবংশী, শাওন হোসাইন, মো. আরিফুল ইসলাম, বশির আহমেদ, মো. মোক্তাদিরুল ইসলাম, অনন্যা নাহার চৈতি, সুশীল কান্তি চাকমা, মো. হাফিজুর সরদার, মিরা খাতুন, মো. আল আমিন ভূঁইয়া, মো. আবু সালেহ, হারুন অর রশিদ মামুন, আশরাফুল মোবারক, আবদুল হাকিম, আতিকুর রহমান, রাজিয়া সুলতানা, পল্টু কুমার রায়, মো. নূর-আলম

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। খসড়া কার্যপত্র পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) অন্যতম লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য পূরণে টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংসদীয় গণতন্ত্র এবং জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন-প্রত্যাশার প্রতিফলন ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - এই বিবেচনায় টিআইবি সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করার জন্য নিয়মিতভাবে 'পার্লামেন্টওয়াচ' শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। একটি কার্যকর সংসদ অনেকাংশে নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ওপর। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ আইনানুগ নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা একইরকম গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ২০০৭ ও ২০০৯ সালে টিআইবি'র গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের আইন-বহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নেওয়া এবং নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি বিভিন্ন পর্যায়ে লঙ্ঘনের প্রবণতা রয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি এর আগে কয়েকটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় নির্বাচন কমিশন অনেকক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয় নি। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয় নি। সরকারি দলের সমর্থকদের দ্বারা বিরোধী নেতা-কর্মীদের দমনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনকে কোনো ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নীরবতা পালন করেছে বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার করেছে। সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারে নি, এবং একইসাথে সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে পারে নি নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষকরে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উদাহরণও তৈরি করতে পারে নি, বরং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। এর ফলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সকল দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারে নি। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনের একাংশ ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। নির্বাচন-পূর্ববর্তী কোনো কোনো সরকারি কার্যক্রম ক্ষমতাসীন দল ও জোট কর্তৃক নির্বাচনকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে বলে দেখা যায় যা বিধি-বহির্ভূত। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা, এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন অমান্যের প্রবণতা দৃশ্যমান হয়। নির্বাচন দিবসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই ব্যালটভর্তি ব্যালটবাক্সসহ বিভিন্ন ধরনের অভূতপূর্ব অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে যা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগসহ আচরণবিধি লঙ্ঘনের যেসব তথ্য ও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্তের আহবানসহ একগুচ্ছ সুপারিশ করেছে টিআইবি, যা দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হবে বলে টিআইবি আশা করছে।

এই গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাসলিমা আক্তার, জুলিয়েট রোজেটি, বিশ্বজিত কুমার দাস এবং অ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাজমুল হুদা মিনা। সব তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান সময় ও মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। খসড়া কার্যপত্র পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচি

মুখবন্ধ

অধ্যায় এক: ভূমিকা **১**
গবেষণার প্রেক্ষাপট ১
গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা ১
গবেষণা পদ্ধতি ২
গবেষণার সময় ৩
গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩
প্রতিবেদনের কাঠামো ৪

অধ্যায় দুই: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো **৫**
প্রাক-নির্বাচনী সময় ৫
নির্বাচনকালীন সময় ৭
নির্বাচন-পরবর্তী সময় ৯
উপসংহার ৯

অধ্যায় তিন: প্রাক-নির্বাচনী সময় **১০**
ভোটার তালিকা হালনাগাদ ১০
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস ১০
নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা ১০
নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ১৩
মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ১৪
উপসংহার ১৯

অধ্যায় চার: নির্বাচনকালীন সময় **২০**
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ২০
নির্বাচনী প্রচারণা ২১
নির্বাচন অনুষ্ঠান ২৬
উপসংহার ২৮

অধ্যায় পাঁচ: নির্বাচন-পরবর্তী সময় **২৯**
নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ২৯
নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ৩১
নির্বাচন পরবর্তী মামলা ও অভিযোগ দায়ের ৩২
নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ৩২
উপসংহার ৩৩

অধ্যায় ছয়: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা **৩৪**
ক্ষমতাসীন সরকার ৩৪
নির্বাচন কমিশন ৩৭
রাজনৈতিক দল ও জোট ৪০
প্রার্থী ৪০
নাগরিক সমাজ ৪০
নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা ৪১
সংবাদ-মাধ্যম ৪১
উপসংহার ৪২

অধ্যায় সাত: উপসংহার ও সুপারিশ **৪৩**
সুপারিশ ৪৪

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি **৪৫**

পরিশিষ্ট **১**: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে উল্লেখযোগ্য আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন ৪৬

পরিশিষ্ট ২: পেশা অনুযায়ী ব্যয় (টাকা) ৪৮
পরিশিষ্ট ৩: প্রচারণার ধরন অনুযায়ী প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয় ৪৮
পরিশিষ্ট ৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের চিত্র ৪৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন যেসব জেলায় রয়েছে ২
চিত্র ২: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় এলাকার সংখ্যা ৩
চিত্র ৩: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ৫
চিত্র ৪: প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয়ের সাথে প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনা ৩৩

সারণির তালিকা

সারণি ১: তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত দল অনুযায়ী প্রার্থীদের ব্যয় (টাকা) ১৪
সারণি ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের দলগত পরিচয় ১৫
সারণি ৩: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ ১৬
সারণি ৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক আয়ের পরিমাণ (দলভিত্তিক) (টাকা) ১৬
সারণি ৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ (দলভিত্তিক) (টাকা) ১৬
সারণি ৬: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় পরিমাণ (টাকায়) ১৭
সারণি ৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় মূল্য (দলভিত্তিক) ১৭
সারণি ৮: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের রাজনীতির অভিজ্ঞতা ১৭
সারণি ৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের অতীতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইতিহাস ১৮
সারণি ১০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা ১৮
সারণি ১১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী বা তার ওপর নির্ভরশীলদের দায় ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য ১৮
সারণি ১২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় (হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) (টাকা) ১৯
সারণি ১৩: তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত দল অনুযায়ী প্রার্থীদের ব্যয় (টাকা) ১৯
সারণি ১৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি ২৪
সারণি ১৫: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত) ২৪
সারণি ১৬: দল অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যয় (টাকা) ২৫
সারণি ১৭: লিঙ্গভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয় (টাকা) ২৫
সারণি ১৮: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম ২৫
সারণি ১৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের দলগত পরিচয় ২৭
সারণি ২০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের রিটার্নে প্রদর্শিত নির্বাচনী ব্যয় (টাকা) ৩২

বক্সের তালিকা

বক্স ১: নির্বাচনী প্রচারে বাধা ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের ২২
বক্স ২: ক্ষমতাসীন দলের মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য হুমকি ২২
বক্স ৩: প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় নির্বাচনে ভোট কারচুপি ২৬
বক্স ৪: সমতল মাঠ না থাকার নিয়ে একজন সাংবাদিকের বক্তব্য ৩৬

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে দেখা যায় কোনো ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হওয়ার পেছনে কয়েকটি ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে হয় - মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মিলিত উদ্যোগ, পছন্দ ও অংশগ্রহণ, এবং প্রতিনিধিত্বশীল ও দায়বদ্ধ সরকার।[১] গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, এবং এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ। এসব অংশীজনের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, ক্ষমতাসীন দল এবং/ অথবা জোট, বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং/ অথবা জোট, প্রার্থী, নাগরিক সমাজ, সংবাদ-মাধ্যম ও নির্বাচন পর্যবেক্ষক।[২]

গত এক দশকে জাতীয় নির্বাচন, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সংস্কারের মধ্যে ছিল নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশনের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী আচরণ বিধি আরও কঠোর করা, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩] এছাড়া নবম সংসদ নির্বাচনের সময়ে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংবাদ-মাধ্যম, ও সাধারণ জনগণের মধ্যে রাজনীতি ও নির্বাচনে দুর্নীতির প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের পক্ষে শক্তিশালী জনমত গঠন করার ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের আইন-বহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নেওয়া এবং নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি বিভিন্ন পর্যায়ে লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষ করা যায় (টিআইবি, ২০০৭ ও ২০০৯)।[৪] নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা প্রণয়নের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর সম্প্রতি ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সম্পন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম একটি নির্বাচন যেখানে সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু জাতীয় সংসদের একটি প্রধান কাজ সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করাও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ তা পর্যালোচনা করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও প্রার্থী, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটুকু আইনানুগভাবে অনুসরণ করেছেন তা পর্যালোচনা করা;
২. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলন করা; এবং
৩. নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

---

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবি, 'রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার', টিআইবি: ঢাকা, ২০১৮।

[২] *ডেইলি স্টার*, 'ইসি অ্যালোন নট রেসপনসিবল ফর হোল্ডিং ফেয়ার ইলেকশন', ২৫ অক্টোবর ২০১৭।

[৩] টিআইবি, *কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা, ২০১৪।

[৪] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অর্থ ব্যয়ের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে। প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই মনোনয়ন-প্রত্যাশী প্রার্থীরা গড়ে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বেশি ব্যয় করে (টিআইবি, ২০০৭)। অন্যদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের গড় ব্যয় ছিল ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা, যা নির্ধারিত ব্যয়সীমার ৩১ লাখ ৫ হাজার ৮৫৯ টাকা অতিরিক্ত (টিআইবি, ২০১০)।

এ গবেষণায় নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য, এবং নির্বাচনের পরবর্তী একমাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ সব নির্বাচনী আসন ও কেন্দ্র, রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এবং অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে এ গবেষণা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় গুণবাচক ও সংখ্যাবাচক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আধেয় বিশ্লেষণ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বাছাইকৃত আসনের বাছাইকৃত প্রার্থীদের কার্যক্রমের ওপর পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়ন: প্রথমে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০টি আসন থেকে ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় নয়টি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ৪৫টি জেলার ৫০টি আসন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা; রাজশাহী বিভাগের বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা; খুলনা বিভাগের মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মাগুরা, বাগেরহাট ও খুলনা; বরিশাল বিভাগের বরগুনা, ভোলা, বরিশাল ও পিরোজপুর; ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর, নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ; ঢাকা বিভাগ থেকে টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর; সিলেট বিভাগে সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভিবাজার; এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটি জেলার আসনগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগ থেকে সবচেয়ে বেশি **১১**টি আসন এবং সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ, সিলেট ও বরিশাল বিভাগ থেকে চারটি করে আসন বাছাই করা হয় (চিত্র ২)।

চিত্র ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন যেসব জেলায় রয়েছে

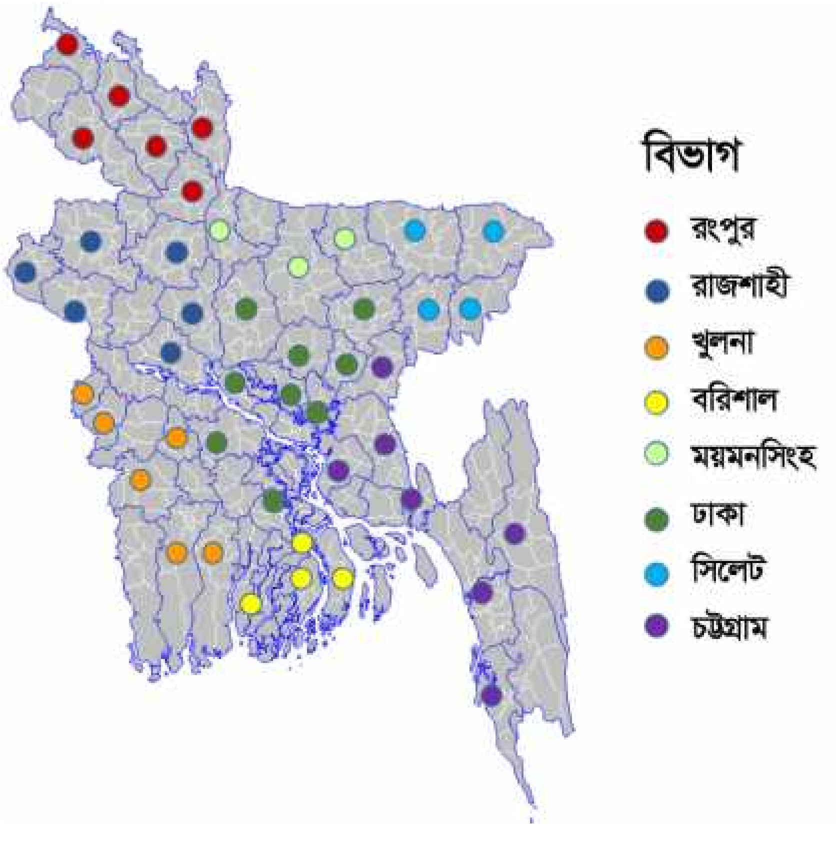

চিত্র ২: বিভাগভিত্তিক সংসদীয় এলাকার সংখ্যা

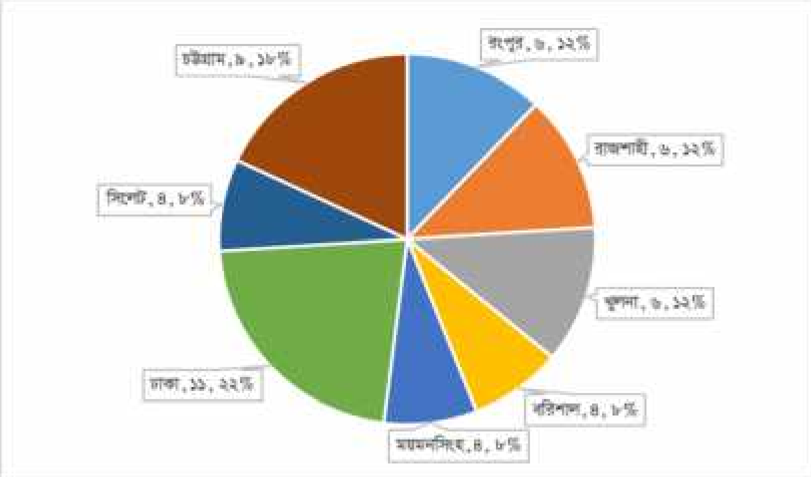

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ: গবেষণা এলাকা হিসেবে ৫০টি আসন বাছাই করার পর প্রত্যেক আসনে প্রধান দুটি দল/ জোটের প্রার্থী বাছাই করে প্রার্থী ও তাদের কার্যক্রমের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কোনো কোনো আসনে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তৃতীয় কোনো শক্তিশালী প্রার্থী থাকলে তাকেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে গবেষণায় মোট **১০৭** জন প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব আসন থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারদের সাক্ষাৎকার[৫] গ্রহণ করা হয়েছে ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে প্রতিটি আসনে প্রধান দুই বা তিনজন প্রার্থীর সকল নির্বাচনী প্রচারণা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয়েছে। এজন্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে জনসংযোগ, ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা, পোস্টার ও স্টিকার ছাপানো, মাইকিং, বিজ্ঞাপন ও অনুদান, একটি নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদিন কতগুলো জনসংযোগ (র‍্যালি, মিছিল, শো-ডাউন, উঠান-বৈঠক) হয়েছে, সেগুলোতে কত মানুষের অংশগ্রহণ ছিল এবং তাদের অংশগ্রহণের জন্য অর্থ বণ্টন করা হয়েছে কিনা, একটি নির্বাচনী এলাকায় কয়টি নির্বাচনী ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন হয়েছে, সেগুলো তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে এবং সেখানে কর্মীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতিদিন কত খরচ করা হয় ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব প্রচারণার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রার্থীর এজেন্ট, দলীয় নেতা-কর্মী এবং প্রচারণায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা; কর্মীদের জন্য ব্যয় সম্পর্কে তথ্য তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচনী এলাকায় একজন প্রার্থী প্রচারণার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান (দোকান, তেলের ডিপো, অফিস, ছাপাখানা, ডেকোরেটর) থেকে ক্রয় করেন তাদের সাথে আলোচনা করে ক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাণ ও দাম সম্পর্কে ধারণা নেওয়া হয়েছে। যাতায়াত ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রার্থীর প্রচারণায় কয়টি মোটর সাইকেল, বাস, পিক আপ, প্রাইভেট গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে, তার জন্য কত তেল খরচ হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর জন্য রেন্ট-এ-কার, গাড়ির মালিক, তেলের ডিপো মালিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি প্রচারণার ব্যয়ের সর্বনিম্ন হারে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ: গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৪ গবেষণার সময়

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ১৫ জানুয়ারি প্রাথমিক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে যা তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত। বর্তমান প্রতিবেদনটি নভেম্বর ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. **দৃশ্যমান ব্যয়:** যথাযথ নিরপেক্ষতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার জন্য শুধু দৃশ্যমান ব্যয় (নির্বাচনী প্রচারণার পোস্টার, জনসংযোগ, সভা-সমাবেশ, বৈঠক ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে

---

[৫] উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারসহ মোট ১৫,৬৯৭ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(মনোনয়নের জন্য দেওয়া চাঁদা, ভোট কেনার জন্য ব্যয়িত অর্থ ইত্যাদি) সংগৃহীত তথ্য যাচাই করার যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাবের কারণে এ ধরনের অদৃশ্য ব্যয়ের ওপর কোনো তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় নি।

২. **ব্যয় প্রাক্কলন:** বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন হার অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে।

৩. **নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন থেকে তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা:** গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য, যেমন নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনজনিত ঘটনা ও নির্বাচন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ, প্রার্থীদের নির্বাচনের ব্যয়ের রিটার্ন ইত্যাদির ওপর লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের জেলা ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়। কিন্তু এসব তথ্যের জন্য বারবার যোগাযোগের পরও উপরোক্ত কার্যালয় থেকে তথ্য পাওয়া যায় নি। ফলে এসব তথ্য সংক্রান্ত বিশ্লেষণ যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় নি।

১.৬ প্রতিবেদনের কাঠামো

এ গবেষণা প্রতিবেদন সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও পরিধি, গবেষণার পদ্ধতি, সময় ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাক-নির্বাচনী সময়, চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচনকালীন সময়, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার আইনি কাঠামো

জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া, যেখানে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বেশ কয়েকটি কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায় - প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনকালীন সময় ও নির্বাচন-পরবর্তী সময় (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)।[৬] প্রত্যেক ধাপেই নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রম রয়েছে, যার একটি বড় অংশ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে এই প্রক্রিয়ায় সরকারসহ অন্যান্য অংশীজনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

চিত্র ৩: জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া

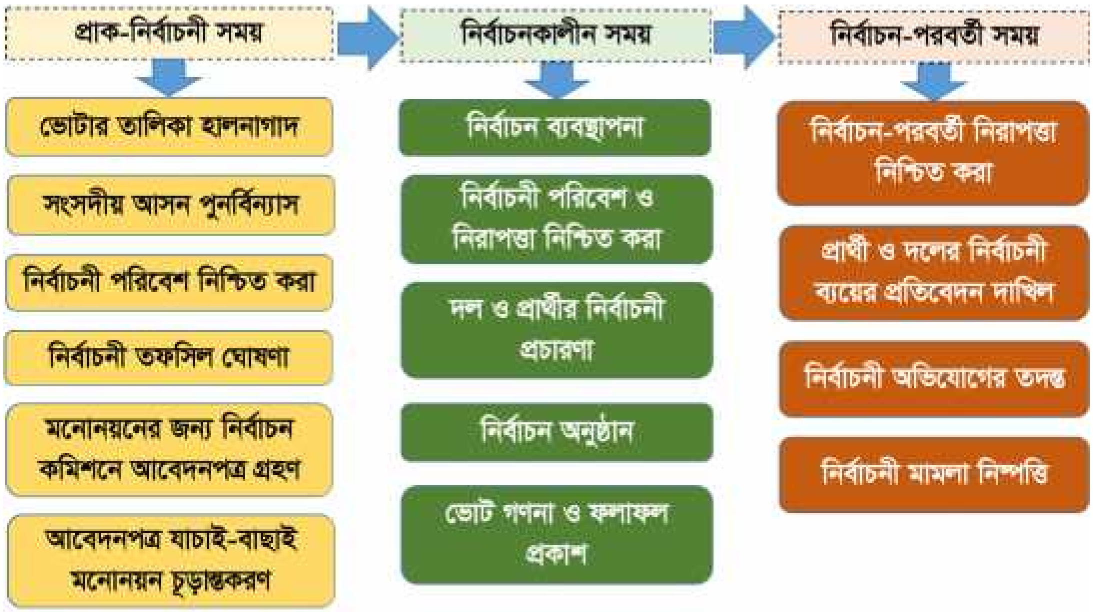

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া 'ভোটার তালিকা আইন ২০০৯', 'সীমানা পুনর্নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬', 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২' ও এই আইনের সর্বশেষ সংশোধন এবং এর অধীনে প্রণীত 'নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮' ও 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮' এবং এসব বিধিমালার সর্বশেষ সংশোধন, এবং 'পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৭' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরবর্তী অংশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর ওপর সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ প্রাক-নির্বাচনী সময়

ভোটার তালিকা হালনাগাদ: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্বের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা অন্যতম।[৭] নির্বাচন কমিশনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'ভোটার তালিকা আইন ২০০৯' অনুযায়ী প্রত্যেক বছর ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়, এবং হালনাগাদকৃত তালিকা প্রকাশ করা হয়।[৮]

---

[৬] ব্রিগেডিয়ার (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন, 'সফল নির্বাচনের জন্য যা প্রয়োজন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০১৮; ব্রিগেডিয়ার (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন, 'সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ও নির্বাচনী নিরাপত্তা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ আগস্ট ২০১৭।

[৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৯। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও এসব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

[৮] *ভোটার তালিকা আইন ২০০৯*, ধারা ১১।

নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ: নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্বের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা।[৯] 'সীমানা পুনর্নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬' অনুযায়ী প্রতিটি আদমশুমারির পর অথবা প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে।[১০]

নির্বাচনী পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও এর মধ্যে অনেকগুলো উপাদান রয়েছে, এবং এটি কোনো আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না হলেও সব অংশীজনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়, এবং এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই। প্রাক-নির্বাচনী সময়ে পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব সরকারের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর হলেও সরকারের দায়িত্বই বেশি। নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী শরিক হিসেবে সরকার নির্বাচনী পরিবেশ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের যেকোনো উদ্বেগ নিয়ে কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে।

নির্বাচনী পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা যা নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার (Electoral Governance) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নির্বাচনী শাসনব্যবস্থা বলতে গণতান্ত্রিক দেশে একটি নির্বাচন হতে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময়সীমা বোঝায়। নির্বাচনী শাসনব্যবস্থায় সাধারণত তিনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে - জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগ। সংসদ প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করে এবং এর সময়কালের পরিধি সাধারণত নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত থাকে। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে। তবে বিচার ব্যবস্থাপনা নির্বাচনী শাসনব্যবস্থার পরিধির মধ্যেও সক্রিয় থাকে।

সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে নির্বাচনের সঙ্গে শরিক সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি করতে হয়। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার শরিকেরা, বিশেষ করে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে পরবর্তী নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা এবং সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা। নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকা, স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান থাকা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি হয়রানিমূলক আচরণ না করা, বাক, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও চর্চা নিশ্চিত থাকা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা দেওয়া, সবার জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচনকালীন সরকার নিশ্চিত করা বা সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবার সঙ্গে সমান আচরণ নিশ্চিত করা, নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো আস্থা অর্জন করা, প্রতিপক্ষকে সংবাদমাধ্যমে সমান সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি।[১১]

এই পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেওয়া, নির্বাচনকালীন সরকার গঠন, সরকারের সাফল্য ও ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধী দলের ব্যর্থতা প্রচার, এবং রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জনসংযোগ, নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ, প্রার্থী যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তুতি, নির্বাচনী বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ও ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন ইত্যাদি নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করে। অন্যদিকে নির্বাচনে সবগুলো দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো আচরণবিধির ব্যত্যয় হচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখা ইত্যাদি নির্বাচন কমিশনের এ সময়ের কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা: নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করার পর আইন অনুযায়ী নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের শেষ দিন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন, এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ঘোষণা করবে।[১২]

মনোনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদনপত্র গ্রহণ: তফসিল ঘোষণার পর আইন অনুযায়ী মনোনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণের নোটিশ দেবেন। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে অবশ্যই ভোটার হওয়া এবং আবেদনপত্রের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে হলফনামার মাধ্যমে আট ধরনের তথ্য প্রদান করতে হয়। এই আট ধরনের তথ্যের মধ্যে রয়েছে (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২) বর্তমানে প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা, (৩) অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল, (৪) প্রার্থীর পেশা, (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস(সমূহ), (৬) অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে তার ভূমিকা, (৭) প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা, এবং (৮) ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে

---

[৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৯।
[১০] *সীমানা পুনর্নির্ধারণ অধ্যাদেশ*, ১৯৭৬, ধারা ৮।
[১১] ব্রিগেডিয়ার (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন, 'সফল নির্বাচনের জন্য যা প্রয়োজন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০১৮; ব্রিগেডিয়ার (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন, 'সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ও নির্বাচনী নিরাপত্তা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ আগস্ট ২০১৭।।
[১২] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ১১।

ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যে কোম্পানির তিনি সভাপতি, বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক।[১৩] একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রয়েছে।[১৪]

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ: আইন অনুসারে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার।[১৫] তিনি নিজস্ব তদন্ত বা কোনো আপত্তি অনুযায়ী যেকোনো প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করতে পারেন, তবে মনোনয়নপত্রে অনুল্লেখ্য কোনো খুঁত, যা পরে সংশোধন করা যায়, থাকলে তা গ্রহণ করতে পারেন।[১৬] যাচাই-বাছাইয়ের পর রিটার্নিং কর্মকর্তার পাঠানো তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে তিনি তা প্রকাশ করবেন, তবে কোনো আপিল থাকলে আপিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা পরিবর্তন করবেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন দিতে হবে এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে জানাতে হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরের দিন রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন। উল্লেখ্য, মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি আসন থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকে মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক নয়।

২.২ নির্বাচনকালীন সময়

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২[১৭] জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। এতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের গঠন (অধ্যায় ২), নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় যেমন নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও তাদের কাজ ও ক্ষমতা, সংসদ সদস্যপ্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, মনোনয়ন পত্র বাছাই করার প্রক্রিয়া, ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা (অধ্যায় ৩), নির্বাচনী ব্যয়, নির্বাচনী প্রচারণা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল (অধ্যায় ৩ ক), নির্বাচনের সময় প্রশাসন এবং আচরণ (অধ্যায় ৩ খ), নির্বাচনী বিরোধ (অধ্যায় ৫), নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি (অধ্যায় ৬), কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন (অধ্যায় ৬ ক), এবং অন্যান্য বিষয় (অধ্যায় ৭) উল্লেখযোগ্য। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, যেমন ব্যালট, ব্যালট বাক্স, অন্যান্য লজিস্টিকস সরবরাহ, নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নির্বাচনকালীন সময়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

দল ও প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী কোনো একজন প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যবস্থা, পরিচালনা অথবা তার সুবিধার জন্য কিংবা নির্বাচনের সাথে জড়িত অথবা প্রাসঙ্গিক কাজের জন্য ব্যয়িত যে কোনো খরচ অথবা দান, ঋণ, অগ্রিম, আমানত হিসাবে কিংবা ভিন্ন নামে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিশোধিত খরচই নির্বাচনী ব্যয়।[১৮] কোনো প্রার্থীর পক্ষ থেকে যে কোনো নির্বাচনী ব্যয়ও ঐ প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় নির্বাচনী খরচ মেটানোর জন্য অর্থের সম্ভাব্য উৎসগুলোর একটি বিবরণ নির্ধারিত ফরমে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে। এর মধ্যে আত্মীয়-স্বজন বা অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ বা চাঁদা হিসাবে প্রাপ্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। এর সাথে অবশ্যই হবে প্রার্থীর সম্পদ, দায়-দেনা, বার্ষিক আয় ও ব্যয়, এবং আয়কর রিটার্ন এর কাগজপত্র নির্ধারিত ফরমে জমা দিতে হবে।[১৯]

আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ ছাড়া প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্য কোনো ব্যক্তি ঐ প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কাউকে কোনো অর্থ দিতে পারবে না, এবং প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর কোনো নির্বাচনী খরচ করতে পারবে না,[২০] এবং একজন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না।[২১]

আইন অনুযায়ী নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন তদন্ত কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করতে হবে,[২২] এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে।[২৩] সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনুসরণের জন্য একটি আচরণ বিধিমালা[২৪] প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে নবম সংসদ

---

[১৩] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ১২ (৩খ)।
[১৪] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, ধারা ১৩ (ক)।
[১৫] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, ধারা ১২।
[১৬] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, ধারা ১৪।
[১৭] বিভিন্ন সময়ে এই আদেশ সংশোধন করা হয়। সর্বশেষবার সংশোধন করা হয় ২০১৮ সালের ৩১ অক্টোবর।
[১৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪ক।
[১৯] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪কক।
[২০] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪খ (১)।
[২১] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪খ (২)।
[২২] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৯১ক।
[২৩] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৯১খ (১)।
[২৪] এসআরও নং ৬০ আইন/৯৬। পরবর্তীতে এসআরও নং ২২৪ আইন/২০০১ দ্বারা ২০ আগস্ট ২০০১ তারিখে সংশোধিত।

নির্বাচনের আগে এই বিধিমালা সংশোধন করে 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮'[২৫] নামে প্রণয়ন করা হয় (২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর সংশোধিত)। এই বিধিমালায় নির্বাচনী প্রচারণায় নিষিদ্ধ কাজের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য বিধি-নিষেধ হচ্ছে:[২৬]

- ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের আগে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা যাবে না।
- কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা এর অঙ্গীকার করা যাবে না, বা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না।
- সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে কোনো সড়কে জনসভা করা যাবে না।
- দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে এবং কোনো সরকারি স্থাপনা ও কোনো ধরনের যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার দেশি কাগজে সাদা-কালো রঙের হতে হবে এবং তার আয়তন ২৩´´X ১৮´´ এর বেশি হতে পারবে না। পোস্টারে প্রতীক ও প্রার্থী এবং মনোনয়নকারী দলের প্রধানের ছবি ছাড়া অন্য কারও ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবে না। প্রার্থীর ছবি সাধারণ ভঙ্গিমার হতে হবে।
- দেওয়াল বা যেকোনো স্থাপনায় লেখা বা আঁকার মাধ্যমে কোনো প্রচারণা চালানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় কোনোভাবেই তিন মিটারের বেশি হতে পারবে না।
- কোনো প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক, বাস, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোনো যানবাহন মিছিল কিংবা মশাল মিছিল করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচারে কোনো আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না।
- মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো শো-ডাউন করা যাবে না।
- কোনো গেট বা তোরণ নির্মাণ করা যাবে না।
- বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবে না।
- প্রচারণামূলক কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।
- কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।
- নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।
- নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোনোভাবেই অতিক্রম করা যাবে না। উল্লেখ্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী এই ব্যয়সীমা একটি আসনে ভোটার-প্রতি দশ টাকা ধরে একজন প্রার্থীর জন্য সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা।[২৭]

নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় শাস্তি। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে শাস্তি অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড। নির্ধারিত ফরমে উল্লিখিত উৎস ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে নির্বাচনী ব্যয় করলে জরিমানাসহ দুই থেকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।[২৮] নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কারো প্রার্থীর পক্ষে ব্যয় করা, নিষিদ্ধ কাজে ব্যয় করা, ব্যয়ের হিসাব জমা না দেওয়া, কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে ভোটদানে বিরত রাখা, কোনো ভোটারকে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য যান-বাহন ভাড়া করা ইত্যাদি কাজের জন্যও শাস্তি একই।[২৯] এছাড়াও হাইকোর্ট কোনো নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করতে পারেন যদি নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ থাকে, মনোনয়নের দিনে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা না থাকে, দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কাজের দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল হাসিল করা হয়, এবং অনুমোদিত অর্থের বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকেন বলে প্রমাণিত হয়।[৩০]

নির্বাচন অনুষ্ঠান: জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য 'নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২' ২০০৮ সালে রহিত করে 'নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮' (The Conduct of Election Rules, 2008) প্রণয়ন করা হয়, এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালের ৭ নভেম্বর সংশোধন করা হয়।[৩১] এই বিধিমালা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা ও এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ও সহায়ক ফরম সরবরাহ করে। এই বিধিমালার উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জামানত, মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন

---

[২৫] ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮; এসআরও নং ২৬৯ আইন/২০০৮।

[২৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা*, ২০০৮, বিধি ৩-১৪।

[২৭] নির্বাচন কমিশন থেকে ৩০০ আসনের প্রত্যেকটির জন্য একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ কত টাকা ব্যয় করতে পারবেন তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন (নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৪০, ৮ নভেম্বর ২০১৮)।

[২৮] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৭৩।

[২৯] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৭৩ ও ৭৪।

[৩০] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৬৩।

[৩১] ২৩ অক্টোবর ২০০৮; এসআরও নং ২৮৬ আইন/২০০৮।

প্রক্রিয়া, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা, প্রতীক, ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের ভোট প্রক্রিয়া, ফলাফল গণনার প্রক্রিয়া ও ফলাফল একত্রীকরণ, নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ফরম, হলফনামা, নির্বাচনী পিটিশন দাখিল ও এর সময় ইত্যাদি প্রক্রিয়া।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ: নির্বাচনকালীন সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্যতা বিবেচনায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ৯১সি অনুসারে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগের জন্য **'স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা ২০১৭'**, এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকদের জন্য **'নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নির্দেশিকা ২০১৮'** [Guidelines for Election Observation (for International Observers) 2018] প্রণয়ন করে। দুটি নীতিমালাতেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সংজ্ঞা, আওতা, পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচনের কমিশনে নিবন্ধনের যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া, পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব, আচরণ, করণীয়, কর্মপদ্ধতি ও নিবন্ধন বাতিলের কারণ বর্ণিত হয়েছে। পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে কোনো রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না, এবং কোনো রাজনৈতিক দল বা তার কোনো অঙ্গ-সংগঠনের সাথে কোনোভাবে যুক্ত কেউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক হতে পারবে না।[৩২]

ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ: 'নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮' অনুযায়ী বিভিন্ন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ভোট গণনা করবেন, এবং তার বিবরণী তৈরি করবেন।[৩৩] তারপর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা সব প্রিজাইডিং কর্মকর্তা দ্বারা পাঠানো ভোট গণনার ফলাফল একসাথে করবেন, যা ভোট গণনার একীভূত বিবরণী বলে উল্লেখ করা হবে।[৩৪] এরপর রিটার্নিং কর্মকর্তা সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে একটি গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করবেন, যে বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা একই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে পাঠাবেন, এবং নির্বাচন কমিশন বিজয়ী প্রার্থীর নাম গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।[৩৫]

২.৩ নির্বাচন-পরবর্তী সময়

নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: নির্বাচনের পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরাজিত প্রার্থী ও তাদের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ জনগণের বিশেষকরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কারণ বিগত বেশ কয়েকটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধানত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের।

প্রার্থী ও দলের নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন দাখিল: আইন অনুযায়ী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব সকল রশিদ এবং বিলসহ প্রতিদিন অর্থ পরিশোধের একটি বিবরণীসহ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে হবে।[৩৬] আইন অনুযায়ী পেশকৃত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে বা অন্য কোনো স্থানে রাখা হবে, যা একশ' টাকা হারে ফি প্রদানসাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে, এবং যেকোনো ব্যক্তিকে দরখাস্তে আবেদনের এবং নির্ধারিত ফি'র সাপেক্ষে সরবরাহ করা হবে।[৩৭] এছাড়া প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।[৩৮]

নির্বাচনী অভিযোগ ও নিষ্পত্তি: একজন দলীয় বা নির্দলীয় ভোটার কোনো অনিয়মের কারণে সংক্ষুব্ধ হলে আইনি প্রতিকার চাওয়া যায়। ভোটের দিনের যেকোনো দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের ৬ মাস বা ১৮০ দিনের মধ্যে আইনি প্রতিকার চাইতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের ফলে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আরোপ করা হতে পারে - এর মধ্যে প্রার্থিতা বাতিল থেকে শুরু করে সংসদ সদস্যপদ হারানো, বা অপরাধ প্রমাণিত হলে কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।[৩৯]

২.৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সংসদ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ বিভিন্ন আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা ও কর্মতৎপরতার ওপর এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়, যেমন নির্বাচনী পরিবেশ নির্ভর করে।

[৩২] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, *স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা* ২০১৭, নীতি ৮.৭ ও ৮.৮।
[৩৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ২৩, ২৪।
[৩৪] *প্রাগুক্ত*, বিধি ২৬।
[৩৫] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৩৯।
[৩৬] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪গ।
[৩৭] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪এএ।
[৩৮] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪ঘ (৩)।
[৩৯] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৭৩।

অধ্যায় তিন

প্রাক-নির্বাচনী সময়

২০১৭ সালের মে মাসে নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরি করে। এই রোডম্যাপে সাতটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় - নির্বাচনী আইনের সংস্কার, পেশি ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন, সবার জন্য সমান সুযোগ, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সহজতর ও সময়োপযোগী করা, সংসদীয় আসনের পুনর্বিন্যাস, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, এবং জাতীয় নির্বাচনের জন্য কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।[৪০] এ অধ্যায়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক-নির্বাচনী সময়ের কার্যক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস, নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও মনোনয়ন চূড়ান্ত করা।

৩.১ ভোটার তালিকা হালনাগাদ

ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ নিয়মিতভাবে করা হয়েছে। একাদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করে নির্বাচন কমিশন, ২০১৬ সালে ৯ লাখ ৬২ হাজার ২৯৬ জন এবং ২০১৭ সালে ৩৩ লাখ ৩২ হাজার ৫৯৩ জন নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং ১৭ লাখ ৪৮ হাজার ৯৩৪ জন মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়।[৪১] সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১০ কোটি ৪১ লাখ ৪২ হাজার ৩৮১ জন, যার মধ্যে নারী ভোটার ৫ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ২৭৬ জন (৪৯.৫৮%), এবং পুরুষ ভোটার ৫ কোটি ২৫ লাখ ১২ হাজার ১০৫ জন (৫০.৪২%)।[৪২] তবে একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নতুন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভোটার তালিকা হালনাগাদের প্রক্রিয়া যথাযথ থাকলেও প্রত্যেক বাড়িতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে।[৪৩]

৩.২ সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।[৪৪] প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ছয়টি পদ্ধতি অনুসরণ করে সীমানাবিন্যাস করা হয়েছে - ২০১৩ সালে নির্ধারিত জেলার আসনসংখ্যা ঠিক রাখা, প্রশাসনিক ইউনিট, বিশেষ করে উপজেলা এবং সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডের অখণ্ডতা যথাসম্ভব বজায় রাখা, ইউনিয়ন বা পৌর এলাকার ওয়ার্ড একাধিক আসনে বিভাজন না করা, যেসব নতুন প্রশাসনিক এলাকা সৃষ্টি হয়েছে বা বিলুপ্ত হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করা, বিলুপ্ত ছিটমহল এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগব্যবস্থা যথাযথ বিবেচনায় রাখা। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪টি আসনের জনসংখ্যা জেলার গড় জনসংখ্যার চেয়ে ২৫% কম বা বেশি দেখা যায়, এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬২টি আসন ভারসাম্যহীন লক্ষ করা যায়।[৪৫] পরে ৫৫টি আসনের সীমানা নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য ও ভোটারদের পক্ষ থেকে ৬৫১টি আপিল উত্থাপন করা হয় - এর মধ্যে ৪০৭টি আপিল নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ২৪৪টি পক্ষে ছিল।[৪৬] এসব আপত্তির ওপর শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে ২৪টি আসনের সীমানা পরিবর্তন করা হয়।[৪৭]

৩.৩ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ, এবং সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করা হয় ও তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রায় ৪৫০টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রধান আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন, সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন, নিরপেক্ষ সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, 'না' ভোটের পুনঃপ্রচলন, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।[৪৮] নিরপেক্ষ সরকার, সেনা মোতায়েন, সীমানা পরিবর্তন, ইভিএম ব্যবহার নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি)

---

[৪০] *দি ডেইলি স্টার*, 'ইসি মেকস পোলস রোডম্যাপ', ২৪ মে ২০১৭।

[৪১] *দি ডেইলি স্টার*, '২.৩ ক্রোর নিউ ভোটারস অ্যাডেড: ইসি ডিসক্লোজেস ড্রাফট ভোটার লিস্ট; টোটাল ভোটারস ১০.৪০ ক্রোর ৩ জানুয়ারি ২০১৮।

[৪২] *দি ডেইলি স্টার*, 'নাম্বার অব ভোটারস নাও ১০.৪১ ক্রোর', ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

[৪৩] *বাংলা ট্রিবিউন*, 'নো ডোর-টু-ডোর ভোটারস লিস্ট আপডেটিং দিস ইয়ার', ১০ জুলাই ২০১৮; মো. আবদুল আলীম, 'ফর আ ক্রেডিবল ইলেকটোরাল রোল', *দি ডেইলি স্টার*, ১ আগস্ট ২০১৫।

[৪৪] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০১০.১৭-১৪৪, ১৪ মার্চ ২০১৮।

[৪৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'জনসংখ্যা বিবেচনায় ৬২ আসন এখন ভারসাম্যহীন', ২৬ মার্চ ২০১৮।

[৪৬] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০১০.১৭-২২৪, ৯ এপ্রিল ২০১৮।

[৪৭] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, গেজেট নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০১০.১৭-২৫৩, ৩০ এপ্রিল ২০১৮।

[৪৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ইসি'র সঙ্গে ৪০ দলের সংলাপ: সেনা মোতায়েন চায় বেশিরভাগ দল', ২০ অক্টোবর ২০১৭।

মতামত ও দাবি ছিল পরস্পরবিরোধী।[৪৯] এসব প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার আওতার মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব পূরণের অঙ্গীকার করে। তবে সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার সরকারের ওপর বলা হলেও সরকারের কাছে প্রেরণ করার উদ্যোগ নেয় নি নির্বাচন কমিশন।

২০১৮ সালে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশন আবেদন আহবান করে।[৫০] ৭৬টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেও যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশন কোনোটিকেই নিবন্ধন দেয় নি।[৫১] রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য যেসব পূর্বশর্ত রয়েছে সেগুলো অনেক কঠিন এবং বাস্তবসম্মত নয় বলে সমালোচনা হয়। এসব শর্তের কারণে নতুন কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পাওয়া সহজ নয় বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। ২০০৯ সালে হাইকোর্টে দায়ের করা ৬৩০ নম্বর রিট পিটিশনের রায়ে আদালত জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯০এইচ ধারা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করা হয় ২০১৮ সালের ২৮ অক্টোবর।[৫২]

কোনো ধরনের সম্ভাব্যতা গবেষণা ছাড়া এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইভিএম কেনার উদ্যোগ নেয় নির্বাচন কমিশন। সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্প পাস হওয়ার আগেই ২০১৮ সালের জুন মাসে ৫০ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২,৫৩৫টি ইভিএম কেনা হয়, এবং ৩,৮২১ কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয়ে ১.৫ লাখ ইভিএম কেনার উদ্যোগ নেয়, এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রস্তাব পাঠায়।[৫৩] নতুন ইভিএম কেনার জন্য নির্বাচন কমিশনের ৩,৮২৫ কোটি টাকার প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পাস করে। এই প্রকল্প অনুযায়ী ১.৫ লাখ ইভিএম কিনতে ৩,৫১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯২ শতাংশ।[৫৪] পরে ইভিএম ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা সংযোজন করে অধ্যাদেশ জারি করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইনের সংশোধন করা হয়,[৫৫] এবং 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা ২০১৮'[৫৬] প্রণীত হয়।

সব দলের অংশগ্রহণ করার সাপেক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' করার ওপর বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হলেও 'রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের প্রয়োজন নেই', এবং 'নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে' বলে নির্বাচন কমিশন অভিমত প্রকাশ করে।[৫৭] ইতোমধ্যে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয় ২০১৮ সালের প্রায় শুরু থেকেই। অন্যদিকে ২০১৮ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে সরকারবিরোধী দলের বিশেষকরে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করার ধারা শুরু হয়। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৪,১৩৫টি মামলায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ৩১৪ জন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়, যাদের মধ্যে গ্রেফতার করা হয় ৪,৬৫০ জনকে।[৫৮] বিএনপি'র পক্ষ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে বিএনপি'র নেতা-কর্মী ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের এজেন্ট, এবং কমিটি ধরে ধরে মামলার আসামি করা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরানো মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনা না ঘটলেও এসব মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, যেগুলো 'গায়েবি মামলা' বলে পরিচিত। দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি বা ঘটনার সময় অনুপস্থিত

---

[৪৯] *প্রাগুক্ত*।
[৫০] *দি ডেইলি স্টার*, 'ইসি সিকস অ্যাপ্লিকেশনস ফ্রম নিউ পার্টিজ ফর রেজিস্ট্রেশন', ৩১ অক্টোবর ২০১৭।
[৫১] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'শর্ত শিথিল করা হোক: রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন', ২৬ জুলাই ২০১৮।
[৫২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে ইসির প্রজ্ঞাপন', ২৬ জুলাই ২০১৮। ২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। তখন ইসি থেকে বলা হয়েছিল, বিষয়টি আপিল বিভাগে বিচারাধীন থাকার কারণে ইসি এ বিষয়ে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করে নি।
[৫৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'কেনা হয়েছে ২৫০০ ইভিএম, আরও কেনা হবে', ৭ জুন ২০১৮; *দি ডেইলি স্টার*, 'হেস্টি ইভিএম প্ল্যান ফর নেক্সট জেএস পোলস', ২৭ আগস্ট ২০১৮।
[৫৪] জাহাঙ্গীর শাহ ও রিয়াদুল করিম, 'ভারতের চেয়ে ১১ গুণ বেশি দামে ইভিএম', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ অক্টোবর ২০১৮। উল্লেখ্য, অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী একটি ইভিএম কিনতে খরচ পড়বে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৩৭৩ টাকা, যেখানে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) যে ইভিএম তৈরি করেছিল তার প্রতিটির দাম পড়েছিল ২০-২২ হাজার টাকা করে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিছু পার্থক্য থাকলেও দামের বিশাল পার্থক্যকে অস্বাভাবিক বলছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। অন্যদিকে ভারতের নির্বাচন কমিশন ওই দেশের লোকসভা, রাজ্যসভাসহ বিভিন্ন নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য নতুন মডেলের ইভিএমের দাম নির্ধারণ করেছে ১৭ হাজার রুপি, যা বাংলাদেশি টাকায় ২১ হাজার ২৫০ টাকা (প্রতি রুপি ১ টাকা ২৫ পয়সা ধরে)। সেই হিসাবে ১১ গুণ বেশি খরচ করে ইভিএম কিনছে বাংলাদেশ।
[৫৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *রিপ্রেজেন্টেশন অব দি পিপল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ২০১৮*, ৩১ অক্টোবর ২০১৮; http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/Law/RPO(Amendment)%20Ordinance,2018.pdf (১৪ জানুয়ারি ২০১৯)।
[৫৬] দেখুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা ২০১৮*, ৭ নভেম্বর ২০১৮; http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/Law/EVM.pdf (১৪ জানুয়ারি ২০১৯)।
[৫৭] *দি ডেইলি স্টার*, ' নো স্কোপ ফর পার্টিস টু হোল্ড টকস উইথ ইসি: সে'স ইসি সেক্রেটারি', ১৭ আগস্ট ২০১৮; *দি ডেইলি স্টার*, 'সিইসি ফাইন্ডস পোলস অ্যাটমস্ফিয়ার স্যাটিসফ্যাকটরি: কমেন্ট কামস এ ডে আফটার রিফট মারড অ্যান ইসি মিটিং', ১৭ অক্টোবর ২০১৮। সিইসি বলেন, শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা নিয়ে ইসির উদ্বেগেরও কিছু নেই। নির্বাচনী পরিবেশ আছে। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা হয়েছে, সীমানা নির্ধারণ হয়েছে, ভোটকেন্দ্র নির্ধারণের কাজ চলছে। সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ভোটে অনিয়ম হবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই: সিইসি', ৭ আগস্ট ২০১৮।
[৫৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'হঠাৎ কেন এত গায়েবি মামলা', ৭ অক্টোবর ২০১৮।

ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৫৯] এছাড়া সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হয়। তবে এ ধরনের কার্যক্রমের পরও 'চমৎকার নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে' বলে সরকারের পক্ষ থেকেও অভিমত প্রকাশ করা হয়।[৬০]

এ ধরনের মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে ২০১৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটের আবেদন করা হয়। রিটে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সারাদেশে বিএনপির জ্যেষ্ঠ আইনজীবীসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে করা চার হাজার মামলা ও তিন লাখেরও বেশি লোককে আসামি করার কারণ জানতে চাওয়া হয়। একইসঙ্গে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। এছাড়া আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত যত গায়েবি মামলা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর তদন্ত বন্ধ এবং এসব গায়েবি মামলার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কমিটি গঠন করে ঘটনার তদন্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে পরে যেন এ ধরনের মামলা দেওয়া না হয়, তার নির্দেশনা চাওয়া হয়। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অগণিত নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার করে গায়েবি বা আজগুবি মামলা দায়ের করা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, রিটে সে বিষয়ে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছিল।[৬১] তবে এই রিটের আগেই বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের অভিযোগ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন সচিব জানান যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।[৬২] পরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা 'গায়েবি' মামলার তদন্ত বন্ধ, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরবর্তীতে এ ধরনের মামলা না দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে করা রিট আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেন হাইকোর্ট।[৬৩]

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল সম্প্রতি "গায়েবি মামলা বলতে কিছু নেই" বলে বক্তব্য দেন। তাঁর মতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কাজেই গায়েবি মামলার যে অভিযোগ করা হচ্ছে আসলে এ রকম কোনো মামলা নেই। বিএনপির অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি আরও বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর তদন্ত হবে, সেখানে কেউ যদি নিরাপদ হন, তাহলে তিনি আইনি ব্যবস্থায়ই মুক্তি পাবেন। গায়েবি বলে অভিধানে কোনো মামলা নেই।[৬৪]

তবে একজন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারের মতে এসব গায়েবি মামলার অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। তাঁর মতে ঢাকার পুলিশ কমিশনার পুলিশ বাহিনীকে গায়েবি মামলা না করতে নির্দেশ দেওয়ার পরও অনেকক্ষেত্রে এ ধরনের মামলা চালু রয়েছে। এসব মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের অনেকের আদালত থেকে জামিন নেওয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কোনো কোনো সম্ভাব্য প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা থাকার কারণে তাঁরা নির্বাচনী প্রচারকাজ চালাতে ভয় পান। এহেন ভীতি সর্বক্ষেত্রে অমূলক নয়।[৬৫]

২০১৮ সালের অক্টোবরে ৭ দফা দাবি নিয়ে মূলধারার কয়েকটি দলের সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা হয়। এসব দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিএনপি, গণফোরাম, জেএসডি, কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ ও নাগরিক ঐক্য। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ অন্যান্য দল ও জোটের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের পদত্যাগ, জাতীয় সংসদ বাতিল, আলোচনা করে নিরপেক্ষ সরকার গঠন; নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করা; বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সব রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; নির্বাচনের ১০ দিন আগে থেকে নির্বাচনের পর সরকার গঠন পর্যন্ত বিচারিক ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া; নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ নির্বাচনপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে তাদের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ না করা, গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করা; এবং তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান সব রাজনৈতিক মামলা স্থগিত রাখা ও নতুন কোনো মামলা না দেওয়া উল্লেখযোগ্য।[৬৬]

---

[৫৯] *প্রাগুক্ত*।

[৬০] *দি ডেইলি স্টার*, 'অ্যাটমস্ফিয়ার কনজেনিয়াল ফর ইলেকশনস: সে'স পিএম', ১ অক্টোবর ২০১৮। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভয়েস অব আমেরিকার সাথে একটি সাক্ষাৎকারে আরও বলেন যে বর্তমান নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য যোগ্য।

[৬১] *নিউজ টোয়েন্টিফোর*, "গায়েবি' মামলা নিয়ে হাইকোর্টের দ্বিধাবিভক্ত আদেশ', ৯ অক্টোবর ২০১৮।

[৬২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না: ইসি সচিব', ২৫ জুলাই ২০১৮।

[৬৩] *বৈশাখী টিভি*, 'গায়েবি' মামলা নিয়ে করা রিট খারিজ', ২৫ নভেম্বর ২০১৮।

[৬৪] *কালের কণ্ঠ অনলাইন*, 'গায়েবি মামলা বলতে কিছু নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী', ১৫ জানুয়ারি ২০১৯। তবে পুলিশের সাবেক এআইজি এবং ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক প্রধান সৈয়দ বজলুল করিমের মতে থানায় যেকোনো মানুষ যেকোনো অভিযোগ নিয়ে যেতেই পারেন। কিন্তু পুলিশ যদি তার দায়িত্ব পালন করে তাহলে মিথ্যা বা গায়েবি মামলা অনেকটাই এড়ানো যায়। তাঁর মতে পুলিশ যদি নৈতিক অবস্থানে থাকে, একটু সাহস দেখায় তাহলেই কেউ তাকে মিথ্যা বা গায়েবি মামলায় বাধ্য করতে পারে না। আসলে এটা অতি উৎসাহী কিছু পুলিশ কর্মকর্তার কারণে হয়। তারাও অনৈতিক সুবিধা নেন, বিনিময়ে রাজনৈতিক সার্ভিস দেন। সূত্র: *আমাদের সময়.কম*, 'মিথ্যা, গায়েবি মামলার নেপথ্যে অতি উৎসাহী কিছু পুলিশ কর্মকর্তা, বললেন সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা', ২ এপ্রিল ২০১৯।

[৬৫] মাহবুব তালুকদার, 'গায়েবি মামলা গায়েবি আওয়াজ নয়', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ নভেম্বর ২০১৮।

[৬৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ড. কামালের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের যাত্রা', ১৩ অক্টোবর ২০১৮।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর এর নেতা ড. কামাল হোসেনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে অর্থবহ সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়, যা সব দলের অংশগ্রহণে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।[৬৭] এর প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সরকারের সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সংলাপ হয়, যেখানে প্রকৃতপক্ষে নির্বাচন কমিশনের কোনো উদ্যোগ ছিল না। এই সংলাপে সরকার ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানানো হয় ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে।[৬৮] এই দাবি মেনে না নিলেও প্রধানমন্ত্রী নতুন কোনো মামলা না দেওয়া ও গ্রেফতার না করা, এবং সভা-সমাবেশ করতে বাধা না দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। নির্বাচনের আগে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও ক্ষমতাসীন দলের সংলাপ হয়, তবে সার্বিকভাবে নির্বাচনকালীন সরকারের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। তবে চূড়ান্তভাবে প্রধান সরকারবিরোধী দলগুলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

৩.৪ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর প্রথম তফসিল ঘোষণা করে।[৬৯] এই তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৯ নভেম্বর ও নির্বাচন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮। তবে এই তফসিল অনুযায়ী প্রচারণার সময় ২৩ দিন রাখা হয় যা বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী।[৭০] এছাড়া নির্বাচনী তফসিল ঘোষণায় নির্বাচন কমিশন তাড়াহুড়া করছে বলে সমালোচনা হয়, যেহেতু এর আগের সব নির্বাচনেই ৯০ দিনের কাউন্টডাউন শুরুর অন্তত একমাস পর তফসিল ঘোষণা করেছিল।[৭১] জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের কারণে সংশোধিত তফসিল ঘোষণা করা হয় ১২ নভেম্বর।[৭২] সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ ডিসেম্বর ও নির্বাচন ৩০ ডিসেম্বর। তবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল কমিশনকে আরও একমাস নির্বাচন পেছানোর অনুরোধ করলেও নির্বাচন কমিশন তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে।[৭৩]

তফসিল ঘোষণার পর সবগুলো নিবন্ধিত দল তাদের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে। দলীয় মনোনয়ন ফরম সবচেয়ে বেশি, ৪ হাজার ৫৮০টি, বিক্রি করে বিএনপি। আর পরেই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ৪ হাজার ২৩টি ফরম, এবং জাতীয় পার্টি (জাপা) ২ হাজার ৮৬৫টি দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি করে। দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রিতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ বড় আটটি দলের আয় ৩২ কোটি টাকার বেশি বলে ধারণা করা হয়।[৭৪] এই মনোনয়ন ফরম বিতরণ ঘিরে মিছিল, মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের শো-ডাউনের ফলে যানজট সৃষ্টি হয়, এবং একটি আসনে একটি দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু হয়। মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের শো-ডাউনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দলগুলোর প্রতি নির্বাচন কমিশন নমনীয় মনোভাব দেখালেও বিএনপি'র বিরুদ্ধে 'আচরণ বিধির লঙ্ঘন' বলে অভিযোগ করে, এবং বিএনপি'র বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৭৫] তফসিল ঘোষণার পরেও বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার অব্যাহত ছিল। বিএনপি'র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ২,০৪৭টি মামলার তালিকা দেওয়া হয়।[৭৬] তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করা হলেও মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতার বন্ধে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

অন্যদিকে তফসিল ঘোষণার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই ক্ষমতাসীন জোট/ দলের মনোনয়ন-প্রত্যাশী প্রার্থীদের প্রচারণা চলমান ছিল। কোনো কোনো আসনে বিরোধী দলের প্রার্থীদেরও প্রচারণা লক্ষ করা যায়। তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ৫২ জন প্রার্থী প্রচারণা চালিয়েছেন বলে লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের ৩২ জন, জাতীয়

---

[৬৭] *দি ডেইলি স্টার*, 'এএল এগ্রিস টু টক উইথ ঐক্যফ্রন্ট', ৩০ অক্টোবর ২০১৮।

[৬৮] *দি ডেইলি স্টার*, '১৪-পার্টি-ঐক্যফ্রন্ট টকস: নট মাচ রিজলভড', ২ নভেম্বর ২০১৮; মিজানুর রহমান, 'সংলাপ হয়েছে, এটাই অগ্রগতি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ নভেম্বর ২০১৮।

[৬৯] *দি ডেইলি স্টার*, 'শিডিউল ফর নেক্সট ইলেকশন অন নভেম্বর ৮', ৫ নভেম্বর ২০১৮।

[৭০] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'তফসিলেই আইন লঙ্ঘন করেছে ইসি?', ১০ নভেম্বর ২০১৮।

[৭১] শাখাওয়াত লিটন ও রশিদুল হাসান, 'ইলেকশন শিডিউল আরলিয়ার দিস টাইম: ইসি ইন দ্যা পাস্ট টুক নিয়ারলি আ মানথ টু অ্যানাউন্স শিডিউল আফটার স্টার্ট অব ৯০-ডে কাউন্টডাউন', *দি ডেইলি স্টার*, ৭ নভেম্বর ২০১৮।

[৭২] *দি ডেইলি স্টার*, 'পোলস নাউ অন ডিসেম্বর ৩০', ১৩ নভেম্বর ২০১৮।

[৭৩] *দি ডেইলি স্টার*, 'পারফরমিং ইলেকশন ডিউটিস: ইসি ওয়ার্নস আরও'স অব স্টার্ন অ্যাকশন ফর ফেইলিওর: সিইসি সে'স নো স্কোপ টু ডেফার পোলস ফারদার', ১৪ নভেম্বর ২০১৮।

[৭৪] বিএনপির মনোনয়ন ফরমের দাম ছিল ৫ হাজার টাকা, এবং ফরম জমা দেওয়ার সময় ২৫ হাজার টাকা করে জামানত দিতে হয়েছে। সব ফরম জমা পড়লে এই খাতে বিএনপির আয় ১৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। আওয়ামী লীগের ফরমের মূল্য ছিল ৩০ হাজার টাকা। ৪ হাজার ২৩টি ফরম বিক্রি করে দলটির আয় ১২ কোটি ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা। জাপা'র ২ হাজার ৮৬৫টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি ২০ হাজার টাকা হিসেবে মোট আয় ৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। এ ছাড়া জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে গণফোরাম ৫ হাজার ১০০ টাকা করে ৩৫০টি মনোনয়ন ফরম বিক্রি করেছে। দলটির আয় ১৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকা, জেএসডি ৫০০ টাকা করে ৫৪৭টি ফরম বিক্রি করে আয় করেছে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৫০০ টাকা, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ১০ হাজার টাকা করে ৬০টি ফরম বিক্রি করে আয় করেছে ৬ লাখ টাকা। তথ্যসূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, 'মনোনয়ন ফরম বিক্রিতে এগিয়ে বিএনপি', ১৮ নভেম্বর ২০১৮।

[৭৫] গোলাম মোর্তজা, 'আচরণবিধি, সংঘর্ষ ও ইসির ইভিএম ব্যস্ততা', *ডেইলি স্টার বাংলা*, ১৪ নভেম্বর ২০১৮।

[৭৬] *ডেইলি স্টার*, 'বিএনপি সাবমিটস টু পিএমও লিস্ট অব ১,০৪৬ কেসেস: ক্লেইমস ৪৬,৭৪৮ অব ইটস অ্যাকটিভিস্টস অ্যাকিউজড, ১০,২৯৮ অ্যারেস্টেড', ৮ নভেম্বর ২০১৮।

পার্টির চারজন, বিএনপি'র দশজন, স্বতন্ত্র একজন ও অন্যান্য দলের পাঁচজন। এই ৫২ জন প্রার্থী তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত গড়ে ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৯৮ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৮২ লাখ ৫৭ হাজার টাকা, এবং আরেকটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২,৯৮৫ টাকা ব্যয় করেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা গড়ে ৭ লাখ ৫২ হাজার ৮০২ টাকা, জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা গড়ে ৫৫ হাজার ৯৭৫ টাকা ও বিএনপি'র প্রার্থীরা গড়ে ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৪১০ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়।

সারণি ১: তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত দল অনুযায়ী প্রার্থীদের ব্যয় (টাকা)

	আওয়ামী লীগ (৩২ জন)	বিএনপি (১০ জন)	জাতীয় পার্টি (৪ জন)	স্বতন্ত্র (১ জন)	অন্যান্য (৫ জন)
গড় ব্যয়	৭,৫২,৮০২	৩,৫৮,৪১০	৫৫,৯৭৫	৭,৮৭০	১,৭৭,৩৬০
সর্বনিম্ন ব্যয়	২,৯৮৫	১০,০০০	১০,০০০	-	২৯,০০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	৮২,৫৭,০০০	১৫,৭২,০০০	৯০,০০০	-	৫,২৪,৮০০

৩.৫ মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ

বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। নির্ধারিত সময়ে মোট আবেদনকারী প্রার্থী ছিলেন ৩,০৬৫ জন। এর মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ক্ষমতাসীন দলের হয়ে মনোনয়ন পান, এবং পরবর্তীতে তিনি সিইসির কার্যালয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যান, যদিও এ বিষয়ে সিইসি তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হন।[৭৭]

যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন ২,২৭৯ জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে, এবং ৭৮৬ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করে, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের তিনজন ও বিএনপি'র ১৪১ জন,[৭৮] যা এর আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় সবচেয়ে বেশি বলে দেখা যায়। মনোনয়ন বাতিলের জন্য মূল কারণ ছিল ঋণ খেলাপি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকা। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধে খেলাপি হওয়ার কারণে ৯৫ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়, যাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৩ জন প্রার্থী ছিলেন বিএনপি'র।[৭৯] অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও মেয়র পদে থাকার কারণে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অর্ধ-শতাধিক মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়, যাদের অনেকেই ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ হিসেবে রিটার্নিং কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে পদত্যাগের সরকারি প্রজ্ঞাপন তাদের হাতে পৌঁছেনি।

তবে মনোনয়নপত্র বাতিলের জন্য একই মানদণ্ডে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ২৬ নভেম্বরে জারি করা পরিপত্রে বলা হয়, সংবিধান এবং দণ্ডবিধির ২১ ধারাসহ আইনের অন্যান্য ধারা পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্রের বৈধতা সম্পর্কে নিদ্ধান্ত দেবেন। এর ফলে মনোনয়ন বৈধ ঘোষণার ক্ষেত্রে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করা হচ্ছে, এবং দ্বিতীয়ত, আপিলে নির্বাচন কমিশন পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। এর ফলে একই আইনি প্রশ্নে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার আশংকা করা হয়।[৮০] যেসব বিষয়ে একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম সিদ্ধান্ত লক্ষ করা যায় সেগুলো হচ্ছে ঋণখেলাপ, লাভজনক পদে থাকা, আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্তি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন কি না সে বিষয়ে আদালতের সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে আদালত বলেছেন, মেয়ররা পদত্যাগ করে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন, আবার পৌরসভার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মেয়ররা পদে থেকে নির্বাচন করতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের মৌখিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরা পদে থেকে সংসদ সদস্য প্রার্থী হলে বাতিল করে দেওয়ার জন্য।[৮১]

পরে নির্বাচন কমিশনে ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর শুনানির পর ২৩৪ জনের মধ্যে ২০২ জনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়।[৮২] অন্যদিকে উচ্চ আদালতের রায়ে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পরও সরকারবিরোধী দলের ২৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়।[৮৩] উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে তিনজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হয়।

---

[৭৭] *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'সিইসি'স নেফিউ গেটস এএল টিকেট', ২৫ নভেম্বর ২০১৮; 'দি নিউট্রালিটি অব দি সিইসি ইজ কোয়েশ্চন্ড ইন দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অব দি নেফিউ অব দি সিইসি', ২৬ নভেম্বর ২০১৮; https://afaae.com/bangladesh/the-neutrality-of-the-ec-is-questioned-in-the-appointment-of-the-nephew-of-the-cec/ (১৪ জানুয়ারি ২০১৯)।

[৭৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'বৈধ মনোনয়নপত্র ২২৭৯, বাতিল ৭৮৬', ২ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৭৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'খেলাপি ঋণের কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল ৯৫ জনের', ৫ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৮০] মিজানুর রহমান খান, 'যোগ্যতা-অযোগ্যতা প্রশ্নে খেয়ালখুশি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ ডিসেম্বর ২০১৮; আলী রিয়াজ, 'মনোনয়ন বাতিলে একই মানদণ্ড ছিল কি?', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ডিসেম্বর ২০১৮; *ডেইলি স্টার*, 'স্ট্রেঞ্জ স্ক্রুটিনি অব নমিনেশন পেপারস', ৬ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৮১] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'খেলাপি ঋণের কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল ৯৫ জনের', ৫ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৮২] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০..৪৬.৪২.০০৫.১৮-২১ (৮ ডিসেম্বর ২০১৮)।
http://www.ecs.gov.bd/files/pJlfMAWmGWTUmxryVG43ZJab1usZtYlw67uOPFp3.pdf (১২ জানুয়ারি ২০১৯)।

অন্যদিকে দেখা যায় কোনো বড় দলেই তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় নি, বরং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সব প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। আওয়ামী লীগে একাধিক জরিপ প্রতিবেদনের তথ্য আর দলীয় প্রধানের করা খসড়া তালিকার ওপর ভিত্তি করে মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়।[৮৪] আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরমের সঙ্গে যুক্ত একটি অঙ্গীকারনামায় বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রার্থী বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবেন, এবং মনোনয়ন না পেলেও দলের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই নির্বাচনে অংশ নেওয়া যাবে না বা দলীয় প্রার্থীর প্রতিকূলে কোনো কাজ করা যাবে না। অঙ্গীকারের ব্যত্যয় ঘটলে ওই প্রার্থী তাৎক্ষণিকভাবে দল থেকে বহিষ্কৃত বলে বিবেচিত হবেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রার্থীর পরিবারের ভূমিকা, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী পট-পরিবর্তনের পরে প্রার্থীর পরিবারের ভূমিকা এবং ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে (ওয়ান-ইলেভেন) প্রার্থীর ভূমিকা জানতে চাওয়া হয়েছে ওই ফরমে।[৮৫]

বিএনপি'র ক্ষেত্রে ফরমের সঙ্গে প্রার্থীকে একটি হলফনামায় স্বাক্ষর করে বলতে হয়েছে যে দলের ও পার্লামেন্টারি পার্টির সমস্ত আদেশ-নিষেধ প্রার্থী মেনে চলবেন, এবং দলের নির্দেশে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বা সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য থাকবেন। দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরে দল পরিবর্তন, সংসদে আসন পরিবর্তন বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে সংঘবদ্ধ বা এককভাবে জোট গঠন করা যাবে না বা সংসদে 'ফ্লোর ক্রস' করা যাবে না। করলে ওই প্রার্থী পদত্যাগ করেছেন বলে বিবেচিত হবেন আর ওই প্রার্থীর সংসদ সদস্য পদ বাতিলের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে দল। এছাড়া প্রার্থীকে হলফ করে বলতে হয়েছে যে তিনি ঋণখেলাপি নন এবং বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব নেই। পদে থাকা অবস্থায় প্রার্থী কোনো দুর্নীতি, অসত্য বা মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। প্রতিবছর প্রার্থী নিজের ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদের বিবরণ দলের চেয়ারপারসনের কাছে দাখিল করবেন।[৮৬]

একটি আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ার কারণে ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব আসনে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৮৬১ জন, যাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৬১, বিএনপি ২৭২, জাতীয় পার্টি ১৭৫, গণ ফোরাম ২৭, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৯৮, স্বতন্ত্র ১২৮, এবং অন্যান্য দলের ৭০০ জন। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ৩৯টি এবং জোট ৫টি। এসব প্রার্থীর মধ্যে নারী ৬৯ জন ও পুরুষ ১,৭৯২ জন।[৮৭]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে দলীয় মনোনয়ন: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে বিভিন্ন দলের ৪৯৪ জন মনোনয়ন-প্রত্যাশীদের মধ্য থেকে ৩২১ জন (আসনপ্রতি গড়ে ৬.৪২ জন) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচন করেন। তবে যেহেতু সব প্রার্থীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেহেতু বেশিরভাগ এলাকায় দুইজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। তবে কয়েকটি এলাকায় তৃতীয় একজন প্রার্থীর ওপরও তথ্য সংগ্রহ করা হয় যার নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই হিসেবে এসব আসনে মোট ১০৭ জন প্রার্থীর ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যাদের মধ্যে নারী ৫ জন ও পুরুষ ১০২ জন। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪১, বিএনপি'র ৪৩, জাতীয় পার্টির ৮, গণ ফোরামের ৫, স্বতন্ত্র ৩, এবং অন্যান্য ৭ জন।

সারণি ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের দলগত পরিচয়

দল	**সংখ্যা**	**শতকরা হার**
আওয়ামী লীগ	৪১	৩৮.৩২
বিএনপি	৪৩	৪০.১৯
জাতীয় পার্টি	৮	৭.৪৮
গণ ফোরাম	৫	৪.৬৭
স্বতন্ত্র	৩	২.৮০
অন্যান্য	৭	৬.৫৪
মোট	**১০৭**	**১০০.০**

[৮৩] *ডেইলি স্টার*, 'খালেদা লুজেস অল থ্রি আপিলস অ্যাট ইসি', ৯ ডিসেম্বর ২০১৮।
[৮৪] *ডেইলি স্টার*, 'গ্রাসরুটস রোল ইন নমিনেশন: এএল ইগনোরস আরপিও, ইটস চার্টার', ১১ নভেম্বর ২০১৮; *দৈনিক প্রথম আলো*, 'জরিপ আর দলীয় প্রধানের তালিকায় ঝুলছে প্রার্থীভাগ্য', ১৬ নভেম্বর ২০১৮।
[৮৫] এছাড়াও ফরমে প্রার্থীর নাম, পরিচয়, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দিতে বলা হয়েছে। কত দিন ধরে সংগঠনে যুক্ত, ছাত্রজীবনে কোন সংগঠন করতেন, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত ছিলেন কি না, কোনো যুব বা শ্রমিক বা পেশাজীবী বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না ইত্যাদি তথ্য প্রার্থীর কাছে জানতে চাওয়া হয়। তথ্যসূত্র: গোলাম মর্তুজা, 'প্রার্থী চেনার নতুন কায়দা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ নভেম্বর ২০১৮।
[৮৬] প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যের ফরমে নাম, পরিচয় ও অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে প্রার্থী ঋণ ও বিলখেলাপি কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। তথ্যসূত্র: গোলাম মর্তুজা, 'প্রার্থী চেনার নতুন কায়দা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ নভেম্বর ২০১৮।
[৮৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ভোটকেন্দ্রে চাই সুষ্ঠু পরিবেশ: একাদশ সংসদ নির্বাচন', ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য: এসব প্রার্থীর মধ্যে বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষিত যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব ৪৬%, স্নাতক ৩৮%, উচ্চ মাধ্যমিক ৯.৩%, এবং অন্যান্য ৬.৭%। প্রার্থীদের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী (৫৩.৩%), যার পরেই রয়েছেন আইনজীবী (১৩%), শিক্ষক (৬.৫%), চিকিৎসক (৫.৬%), এবং বাকিরা অন্যান্য পেশার (২১.৬%)।[৮৮]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় মাসিক আয় ৬ লাখ ২৬ হাজার ৫৯১ টাকা; এদের মধ্যে সর্বনিম্ন আয় ১৮ হাজার ৭৮৯ টাকা ও সর্বোচ্চ আয় ১ কোটি ৩৮ লাখ ১৯ হাজার ৮৯৪ টাকা। দেখা যায় বেশিরভাগ প্রার্থীর আয়ের একাধিক উৎস রয়েছে, এবং ব্যবসা বা শিল্প-কারখানা থেকে আয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, যার পরেই রয়েছে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত ভাতা (সারণি ৩)। আরও দেখা যায়, আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মাসিক গড় আয় সবচেয়ে বেশি (১৩ লাখ ২৯ হাজার ১৭৬ টাকা), যেখানে গণ ফোরামের প্রার্থীদের মাসিক গড় আয় সবচেয়ে কম (৯১ হাজার ৩৯৯ টাকা) (সারণি ৪)।

সারণি ৩: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ

আয়ের উৎস	**প্রার্থীর সংখ্যা**	**শতকরা হার (%)**	**গড় আয় (টাকা)**
চাকরি	২৩	২১.৫০	৮৪,৭৫৬
ব্যবসা/শিল্প-কারখানা	৬০	৫৬.০৭	৫,৩৩,৯৭৫
পেশাজীবী (উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি)	২৭	২৫.২৩	৭৬,০৬০
কৃষি	৫২	৪৮.৬০	২২,১৮০
শেয়ার	৩০	২৮.০৪	১,৪০,৪৬৩
ব্যাংক ও ডিপোজিট থেকে মুনাফা	২৫	২৩.৩৬	৫০,৯১৯
বাড়ি ভাড়া থেকে আয়	৫৩	৪৯.৫৩	১,৪৫,৩৯১
সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত ভাতা	২৬	২৪.৩০	২,১৮,৮১৫
অন্যান্য*	২৫	২৩.৩৬	৭৫,৪৯৬
মোট	**১০৭**	**১০০**	**৬,২৬,৫৯১**

* অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, পেনশন, সেমিনার হতে সম্মানী, লিমিটেড কোম্পানি হতে আয়।

সারণি ৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক আয়ের পরিমাণ (দলভিত্তিক) (টাকা)

	আওয়ামী লীগ (৪১ জন)	**বিএনপি (৪৩ জন)**	**জাতীয় পার্টি (৮ জন)**	**গণ ফোরাম (৫ জন)**	**স্বতন্ত্র (৩ জন)**	**অন্যান্য (৭ জন)**
গড় আয়	১৩,২৯,১৭৬	১,৯৬,৯৪৬	২,৮০,১৯৮	৯১,৩৯৯	২,০৪,৩৩৮	১,০৯,৮১৭
সর্বনিম্ন আয়	২০,০০০	২৩,৩৩৩	৫৪,৭৫০	১৮,৭৯৮	৭৯,০৩০	১৯,০০০
সর্বোচ্চ আয়	১,৩৮,১৯,৮৯৪	১২,৫৫,১১৬	৫,১৯,১৯১	৩,১২,৬২২	৩,২৭,৪১৮	৩,৬০,৮১৬

অন্যদিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় মাসিক ব্যয় ২ লাখ ১০ হাজার ২৩ টাকা; এদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যয় নয় হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ব্যয় ২০ লাখ ৮৩ হাজার ৩৩৩ টাকা। আরও দেখা যায়, আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মাসিক গড় ব্যয় সবচেয়ে বেশি (৩ লাখ ৯৬ হাজার ৬৪ টাকা), যেখানে গণ ফোরামের প্রার্থীদের মাসিক গড় ব্যয় সবচেয়ে কম (৫০ হাজার ৪৬৯ টাকা) (সারণি ৫)। উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নয়জন হলফনামায় তাদের ব্যয়ের তথ্য উল্লেখ করেন নি।

সারণি ৫: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ (দলভিত্তিক) (টাকা)

	আওয়ামী লীগ (৩৮ জন)	**বিএনপি (৩৯ জন)**	**জাতীয় পার্টি (৭ জন)**	**গণ ফোরাম (৪ জন)**	**স্বতন্ত্র (৩ জন)**	**অন্যান্য (৭ জন)**
গড় ব্যয়	**৩,৯৬,০৬৪**	**১,০১,৩৫৯**	**৭৬,৭৬২**	**৫০,৪৬৯**	**১,১১,১৯০**	**৭২,২৮৩**
সর্বনিম্ন ব্যয়	১৬,৭২৫	১২,৫০০	৩১,০০০	৯,০০০	৫০,০০০	১০,০০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	২০,৮৩,৩৩৩	৬,৩৩,৭৩৯	১,৬২,৮০৪	১,৩০,৩৮০	২,০৮,৩৩৩	২,৯৩,৮২৩

এসব প্রার্থীর হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাদের সম্পদের গড় পরিমাণ ৮ কোটি ৪৮ লাখ ৫০ হাজার ৯৯৬ টাকা - এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৪ কোটি ২৩ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৬ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা। সম্পদের ধরনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণ ও ব্যাংকে গচ্ছিত সঞ্চয়। আবার পরিমাণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি রয়েছে শেয়ার, সঞ্চয়পত্র বা স্থায়ী আমানতের বিনিয়োগ, শহরে বাড়ি/ ফ্ল্যাট/ বাণিজ্যিক ভবন ও অকৃষি জমি (সারণি ৬)।

[৮৮] ২৮৬টি আসনে কেবল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটের প্রার্থীদের ওপর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রার্থীদের মধ্যে স্নাতকোত্তর ৩৩.৪%, স্নাতক ৩৪.৪%, উচ্চ মাধ্যমিক ১১.৪%, মাধ্যমিক ৩.৩%, অন্যান্য ১৬.৬%। এসব প্রার্থীর মধ্যে ব্যবসায়ী ৬২%, আইনজীবী ১০%, কৃষিজীবী ৫%, শিক্ষক ২%, অন্যান্য ২২%। তথ্যসূত্র: শাখাওয়াত লিটন ও মোহাম্মাদ আল মাসুম মোল্লা, 'ইট'স বিজনেসমেনস পার্লামেন্ট এগেইন?', *ডেইলি স্টার*, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮।

সারণি ৬: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় পরিমাণ (টাকায়)

সম্পদের বিবরণ	প্রার্থীর সংখ্যা	সম্পদের গড় পরিমাণ (টাকা)
কৃষি জমি	৭০	৫৯,৬৬,৯৩৭
অকৃষি জমি	৭৭	১,২৫,২১,৭৫৩
বসতভিটা	৪২	৫১,৯৯,০৮৯
শহরে বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ভবন	৭৫	১,৭৩,৫৯,৮৪০
ব্যাংকে গচ্ছিত সঞ্চয়	৯০	৯৭,৫০,৭৯০
গাড়ি	৮৬	৭৬,৯৮,১১৫
শেয়ার	৪৭	৫,০৬,৯০,৪৪০
সঞ্চয়পত্র বা স্থায়ী আমানতের বিনিয়োগ	৪০	২,১২,২৯,৭৮৮
নগদ টাকা	৯২	৭০,৬৪,২৮২
স্বর্ণ	৯৩	৯,০৫,১২৬
ইলেকট্রনিক সামগ্রী	৯০	২,৬১,০৬১
আসবাবপত্র	৯৪	৩,৬০,৯৯৩
অন্যান্য*	৩৮	১,৬২,৬০,৯২৫
সর্বমোট	**১০৭**	**৮,৪৮,৫০,৯৯৬**

* অন্যান্যের মধ্যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, মার্কেট ও ব্যবসার মূলধন, দোকান হতে ভাড়া, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সম্পদের গড় সম্পদের মূল্য সবচেয়ে বেশি (১১ কোটি ৯৬ লাখ ১৬ হাজার ৬১৫ টাকা), এবং গণ ফোরামের প্রার্থীদের সম্পদের গড় মূল্য সবচেয়ে কম (২ কোটি ৬৯ লাখ ৮০ হাজার ৮২২ টাকা) (সারণি ৭)।

সারণি ৭: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সম্পদের গড় মূল্য (দলভিত্তিক)

রাজনৈতিক দল	প্রার্থীর সংখ্যা	সম্পদের গড় মূল্য (টাকা)
আওয়ামী লীগ	৪১	১১,৯৬,১৬,৬১৫
বিএনপি	৪৩	৭,৪২,১৪,৩৪৭
জাতীয় পার্টি	৮	৩,৫২,৫৮,১৬৫
গণ ফোরাম	৫	২,৬৯,৮০,৮২২
স্বতন্ত্র	৩	৭,৮৮,০২,৪৯৭
অন্যান্য	৭	৪,৭১,৬৮,৭৮৯

প্রার্থীদের রাজনৈতিক তথ্য: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাদের মধ্যে সর্বাধিক ২৭.৩ শতাংশের রাজনীতির অভিজ্ঞতা ২০ থেকে ২৯ বছর (সারণি ৮)।

সারণি ৮: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের রাজনীতির অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা (বছর)	প্রার্থীর সংখ্যা*	শতকরা হার
১০ বছরের কম	১৪	১৪.৮
১০-১৯	১৪	১৪.৮
২০-২৯	২৬	২৭.৩
৩০-৩৯	২৫	২৬.৩
৪০-৪৯	১০	১০.৫
৫০ বছরের বেশি	৬	৬.৩
মোট	**৯৫**	**১০০.০**

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ৯৫ জনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানা যায়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৩০.৮% এবারই প্রথমবার সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৮৭.৮% প্রার্থীর। তবে দুই থেকে চারবার সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন এমন প্রার্থীর সংখ্যাই বেশি (৩৬.৪%) (সারণি ৯)। দেখা যায় একজন প্রার্থী এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আটবার জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।

সারণি ৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের অতীতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইতিহাস

জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
এবারই প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছেন	৩৩	৩০.৮
একবার অংশগ্রহণ করেছেন	২৭	২৫.২
দুই থেকে চার বার অংশগ্রহণ করেছেন	৩৯	৩৬.৪
পাঁচ বা এর বেশি বার অংশগ্রহণ করেছেন	৮	৭.৫
মোট	**১০৭**	**১০০.০**

প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য: প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ৫৮ জনের (৫৪.২%) বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে। বর্তমানে মামলা চলছে ৩৬ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে এবং ৪৩ জনের বিরুদ্ধে পূর্বেও মামলা হয়েছিল (সারণি ১০)। দেখা যায় বর্তমানে চলমান মামলার মধ্যে সর্বনিম্ন এক থেকে সর্বোচ্চ ৩৩টি পর্যন্ত মামলা রয়েছে (মাথাপিছু গড়ে সাতটি মামলা), এবং অতীতে সর্বনিম্ন এক থেকে সর্বোচ্চ ২১টি পর্যন্ত মামলা রয়েছে (মাথাপিছু গড়ে চারটি মামলা)। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা রয়েছে বিএনপি'র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে - মাথাপিছু ৮.৬৮টি করে, এবং জাতীয় পার্টি ও গণ ফোরাম প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা চলমান নেই। অন্যদিকে দেখা যায়, অতীতে সব প্রার্থীর বিরুদ্ধেই কোনো না কোনো ফৌজদারি মামলা হয়েছে।[৮৯]

সারণি ১০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা

দল	বর্তমান ফৌজদারি মামলা		অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা	
	প্রার্থীর সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	প্রার্থীর সংখ্যা	মামলার সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৩	৩	১৯	৮৯
বিএনপি	২৮	২৪৩	১৪	৪৮
জাতীয় পার্টি	-	-	৪	৫
গণ ফোরাম	-	-	২	৪
স্বতন্ত্র	১	১	৩	৫
অন্যান্য	৪	১১	১	৩
মোট	**৩৬**	**২৫৮**	**৪৩**	**১৫৪**

প্রার্থীদের দায় ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য: হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ৫০ জনের দায় ও ১১ জনের ঋণ আছে। উক্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন প্রার্থী নিজে অথবা যৌথভাবে অথবা নির্ভরশীল কর্তৃক অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায় রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের, যেখানে গণ ফোরামের কোনো প্রার্থীর দায় বা ঋণ নেই। আবার গড় পরিমাণের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দায় রয়েছে জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের (গড়ে ৪ কোটি ৮৪ লাখ ৪৫ হাজার ৮০৫ টাকা), এবং সবচেয়ে বেশি ঋণ রয়েছে বিএনপি'র প্রার্থীদের (গড়ে ৯ কোটি ৪৮ লাখ ৩২ হাজার ৭৮১ টাকা) (সারণি ১১)।

সারণি ১১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী বা তার ওপর নির্ভরশীলদের দায় ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক দল	দায় সংক্রান্ত তথ্য		ঋণ সংক্রান্ত তথ্য	
	প্রার্থীর সংখ্যা	গড় পরিমাণ (টাকা)	প্রার্থীর সংখ্যা	গড় পরিমাণ (টাকা)
আওয়ামী লীগ	২৬	৩,৩৩,৫৩,০৭৮	৩	৩,৬০,৬৮,২০০
বিএনপি	১৭	২,৩৭,৭০,৯১৮	৪	৯,৪৮,৩২,৭৮১
জাতীয় পার্টি	৪	৪,৮৪,৪৫,৮০৫	২	৪৫,৩৩,৯৮৯
গণ ফোরাম	-	-	-	-
স্বতন্ত্র	১	৫২,৪৪,১৮২	২	৫,০৯,৩৫,৯২১
অন্যান্য	২	৩,১৪,৯৬,৬২১	-	-
মোট	**৫০**	**৩,০৬,৬৬,১৩৬**	**১১**	**৫,৪৪,০৬,৮৬৮**

[৮৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৯৯টি আসনের সব প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে *সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)* জানায় প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান মামলা আছে ১৬ দশমিক ৯৯ শতাংশের (৩১৩ জন)। অতীতে মামলা ছিল ২২ দশমিক ৯১ শতাংশ বা ৪২২ জনের বিরুদ্ধে। তথ্যসূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, 'হামলা-মামলা-হয়রানিতে অনেক প্রার্থী প্রচার চালাতে পারছেন না: সুজন', ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮। বর্তমানে মামলা চলছে যাদের বিরুদ্ধে তাদের ১৭৭ জন বিএনপি'র প্রার্থী। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের ২০ জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা চলছে। এছাড়া বিরোধী দলের প্রার্থীদের মধ্যে ৪১ জনের বিরুদ্ধে সিআরপিসি'র ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে। তথ্যসূত্র: *ডেইলি স্টার*, '৪৯৭ ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ ওয়েলথ ওয়ার্থ ১ ক্রোর+ টাকা', ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮।

প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য: দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের চারজন নির্বাচনে সম্ভাব্য ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস সম্পর্কে হলফনামায় তথ্য দেন নি। তিনজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত সম্ভাব্য ব্যয় দেখিয়েছেন (সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত)।

সারণি ১২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় (হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) (টাকা)

	নিজস্ব উপার্জন	আত্মীয়-স্বজন (অনুদান)	অনাত্মীয় (অনুদান)	আত্মীয়-স্বজন (ঋণ)	অনাত্মীয় (ঋণ)	দল থেকে প্রাপ্ত অর্থ	অন্যান্য	মোট
প্রার্থীর সংখ্যা	**১০১**	**৪৫**	**১৬**	**২৮**	**১২**	**৫**	**২**	**১০৩**
গড় ব্যয়	১৪,৪৩,৭৮৯	৭,৬০,৮৪২	৬,১২,৫০০	৭,৫০,০০০	৫,৫৮,৩৩৩	৩,৪০,০০০	৬,০০,০০০	২১,১৬,১২২
সর্বনিম্ন ব্যয়	৫০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	২,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	৩,০০,০০০	৩,৫০,০০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	৩০,০০,০০০	২৫,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৬,০০,০০০	২৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৯,০০,০০০	৩০,০০,০০০

তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রার্থীদের ব্যয়: গবেষণায় দেখা যায় তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৫ জন প্রার্থী গড়ে ২ লাখ ১৪ হাজার ৭৭৫ টাকা ব্যয় করেছেন, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪১ জন, জাতীয় পার্টির আটজন, বিএনপি'র ৪১ জন, গণ ফোরামের পাঁচজন, স্বতন্ত্র তিনজন ও অন্যান্য দলের সাতজন। এর মধ্যে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ১৪ লাখ ৬৮ হাজার টাকা, এবং আরেকজন সর্বনিম্ন ৩৭,৫০০ টাকা ব্যয় করেছেন। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, জন-সংযোগ ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা গড়ে ৪ লাখ ৮৩৩ টাকা, জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা গড়ে ৫৮ হাজার ৩২৫ টাকা ও বিএনপি'র প্রার্থীরা গড়ে ৯৬ হাজার ৯৮৯ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়।

সারণি ১৩: তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত দল অনুযায়ী প্রার্থীদের ব্যয় (টাকা)

	আওয়ামী লীগ (৪১ জন)	বিএনপি (৪১ জন)	জাতীয় পার্টি (৮ জন)	গণ ফোরাম (৫ জন)	স্বতন্ত্র (৩ জন)	অন্যান্য (৭ জন)
গড় ব্যয়	৪,০০,৮৩৩	৯৬,৯৮৯	৫৮,৩২৫	৫৬,০০০	১,৭৭,৬৬৭	১,২৩,০১৪
সর্বনিম্ন ব্যয়	৫৫,০০০	৫২,৫০০	৪৮,০০০	৩৭,৫০০	৩৮,৫০০	৪২,৫০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	১৪,৬৮,০০০	২,৬৮,৫০০	৯৪,০০০	৭৩,০০০	৪,৪০,৫০০	৩,৫৩,০০০

৩.৬ উপসংহার

প্রাক-নির্বাচনী সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে এই পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন তার নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে ভোটার তালিকা হালানাগাদ ও সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস সময়মতো সম্পন্ন করলেও সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রমাণ করতে সফল হয় নি। সার্বিকভাবে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে নি, যেমন একদিকে বিরোধী দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ইভিএম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের দাবি অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি, এবং অন্যদিকে ক্ষমতাসীন জোটের মতামত অনুযায়ী ইভিএম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তফসিল ঘোষণা বা সবার জন্য সমান সুযোগ আছে বলে বিরোধিদলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারকে সমর্থন করা। এছাড়া মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনার ঘাটতির ফলে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীলতা নির্বাচন কমিশনের দৃঢ়তার ঘাটতির প্রকাশ। এই পর্যায়ে আরও দেখা যায় বিশেষকরে ক্ষমতাসীন দল ও জোটের অনেক মনোনয়ন-প্রত্যাশী প্রার্থী তফসিল ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নিজ নিজ আসনে প্রচারণা চালিয়েছেন, এবং এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যয় করেছেন। এছাড়া বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূলের মতামত না নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।

নির্বাচনকালীন সময়

এ অধ্যায়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচন-কালীন সময়ের কার্যক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্বাচনী প্রচারণা, নির্বাচন অনুষ্ঠান, এবং ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ।

৪.১ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ৭০২ কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করে। এ হিসাবে প্রতি আসনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে দুই কোটি ৩৪ লাখ টাকা। ৭০২ কোটি টাকার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা ব্যয় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় ৩৯৪ কোটি টাকার কাছাকাছি।[৯০] তবে জানা যায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো থেকে বরাদ্দ দাবি করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল পুলিশের ৪২৪ কোটি, র‍্যাবের ৫১.৬২ কোটি, বিজিবি'র ৭২ কোটি, আনসারের ৩৮১ কোটি এবং কোস্টগার্ডের ৩.৮৭ কোটি টাকা।[৯১] এ দাবির প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য প্রায় ৩৯৪ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়, যার মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৬০ কোটি ৩৭ লাখ, পুলিশের জন্য ১০২ কোটি ২৬ লাখ, বিজিবির জন্য ৫৩ কোটি ৬১ লাখ, আনসারের জন্য ১৬৩ কোটি ১১ লাখ, র‍্যাবের জন্য ১৩ কোটি ৫১ লাখ, কোস্টগার্ডের জন্য ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়।[৯২]

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়। নির্বাচন কমিশন ২০১৮ সালের ৯ নভেম্বর ৬৬ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়, যাদের ৬৪ জন ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং দুইজন বিভাগীয় প্রশাসক।[৯৩] অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ৫৮২ জন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ৪০,১৮৩ জন, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ২,০৭,৩১২ জন, এবং পোলিং কর্মকর্তা ৪,১৪,৬২৪ জন।[৯৪]

নির্বাচনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য মোট ৬,০৮,০০০ জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়। এদের মধ্যে পুলিশ ১,২১,০০০ জন, আনসার ৪,৪৬,০০০ জন, গ্রাম পুলিশ ৪১,০০০ জন, র‍্যাব ৬০০ প্লাটুন, বিজিবি ৯৮৩ প্লাটুন, সেনাবাহিনী ৪১৪ প্লাটুন, ৪৮ প্লাটুন নেভি, এবং কোস্টগার্ড ৩০ প্লাটুন। প্রত্যেক কেন্দ্রে এক থেকে দুইজন পুলিশ ও ১২ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত ছিল। ২৪ ডিসেম্বর থেকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা মোতায়েন করা হয়।[৯৫]

নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম ঠেকানোর জন্য প্রত্যেক আসনে যুগ্ম জেলা জজ ও সহকারী জজের সমন্বয়ে ১২২টি নির্বাচন তদন্ত দল গঠন করা হয় ২০১৮ সালের ২৫ নভেম্বর। তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১,৩৮২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ৬৪০ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৯৬]

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় ৮১টি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অনুমতি দেওয়া হয়। নির্বাচনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক ছিলেন ২৫,৯০০ জন, বিদেশী পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, বৈদেশিক মিশন কর্মকর্তা ৬৪ জন, এবং বৈদেশিক মিশনে কর্মরত বাংলাদেশি পর্যবেক্ষক ৬১ জন।[৯৭] তবে সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতির ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত থাকতে পারে নি। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা না পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র তাদের কোনো সংগঠনকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পাঠাতে পারবে না বলে জানায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, যথাসময়ে ছাড়পত্র ও ভিসা না দেওয়ায় তাদের সংগঠনগুলো এবারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে না। বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা না করায় তাদের ব্যাংককভিত্তিক আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা দ্য এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন (এনফ্রেল) নির্বাচনে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)

---

[৯০] সাইদুর রহমান, 'একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতি আসনে ইসির খরচ ২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ অক্টোবর ২০১৮।

[৯১] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চায় ৯৩২ কোটি টাকা, ইসির বরাদ্দ ৪০০ কোটি', ১০ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৯২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য বরাদ্দ ৩৯৪ কোটি', ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৯৩] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৩৭, তারিখ ৮ নভেম্বর ২০১৮। http://www.ecs.gov.bd/files/1BYSf0MyGXw2q7ELUns6Zuep3Z4VpVwX9LwYtx31.pdf (১২ জানুয়ারি ২০১৯)।

[৯৪] শাখাওয়াত লিটন, 'পার্টিসিপেটরি পোলস, ফর শিওর', *ডেইলি স্টার*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৯৫] *প্রাগুক্ত*।

[৯৬] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০৪৫.৩৬.০০১.১৮-৯২, তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৮।

[৯৭] শাখাওয়াত লিটন, 'পার্টিসিপেটরি পোলস, ফর শিওর', *ডেইলি স্টার*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

আগেই এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ না করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের নির্বাচনে ২ লাখ ১৮ হাজার দেশি এবং ২২৫ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে দেশি পর্যবেক্ষক ছিল ১ লাখ ৫৯ হাজার ১১৩ জন এবং বিদেশি ৫৯৩ জন। ২০১৪ সালের নির্বাচনে দেশি পর্যবেক্ষক ছিলেন ৮ হাজার ৮৭৪ জন।[৯৮]

নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন পেলেও ১৫টি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) বিদেশি অর্থ ছাড়ের বিষয়ে এনজিও ব্যুরোর অনাপত্তিপত্র না পাওয়ার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকের পক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। ফলে প্রায় ৮ হাজার পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণে থাকতে পারবে না বলে আগেই আশঙ্কা করা হয়। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী একাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ৮১টি প্রতিষ্ঠান ৩৪ হাজার ৬৭১ জন পর্যবেক্ষকের জন্য ইসিতে আবেদন করে। সেখান থেকে কমিশন বাছাই করে ২৫ হাজার ৯২০ জন দেশি পর্যবেক্ষকের তালিকা অনুমোদন করে। এদের মধ্যে ২২টি পর্যবেক্ষক সংস্থার মোর্চা ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ইডব্লিউজি) ২২টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫ হাজার পর্যবেক্ষক রয়েছেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য সাতটি প্রতিষ্ঠান (জানিপপ, সলিডারিটি, উত্তরণ, এসিডি, আইইডি, জিইউকে ও বাঁচতে শেখা) এনজিও ব্যুরো থেকে অনাপত্তিপত্র পেয়েছে।[৯৯]

তবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১০ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৬ জেলার ১৪৯টি আসনে প্রায় ২৫০টি সংঘাতের ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু ঘটে, এবং ১,১৬০ জন আহত হন। এসব ঘটনায় সাতজন প্রার্থীসহ ৭৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তফসিল ঘোষণার পর থেকে সরকারবিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারও অব্যাহত ছিল - ৮ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ১১,৫৮৬ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[১০০]

নিয়ন্ত্রণমূলক নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে ১৫টি আন্তর্জাতিক সংগঠন তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে ২০১৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এনফ্রেল একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে ক্ষমতাসীন সরকার সুশীল সমাজ, বিরোধী দল ও গণমাধ্যমের ওপর খড়গহস্ত হয়েছে। নির্বাচনী প্রচার শুরুর পর থেকে বিভিন্ন সহিংসতার তথ্য উল্লেখ করে আরও বলা হয় যে, এসব সহিংসতা বাংলাদেশের ভোটারদের মনে ভীতি সঞ্চারের একটি প্রক্রিয়া। এ কারণে নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় না, নির্বাচনী পরিবেশের ওপর নির্ভর করে সুষ্ঠু নির্বাচন।[১০১] জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষে তার মুখপাত্র নির্বাচনী সহিংসতা এবং বিরোধীদের গ্রেফতারের ঘটনায় তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[১০২] নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে হাউজ অব কমন্সের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখনো হয় নি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি, ক্ষমতায় থাকার কারণে ক্ষমতাসীন দলের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি বিদ্যমান। আইনের প্রতি আস্থা এখানে কম।" নির্বাচন কমিশেনের স্বাধীনতা নিয়েও এই প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।[১০৩]

৪.২ নির্বাচনী প্রচারণা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো (৫০টি) আসনে প্রচারণার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে এককভাবে সক্রিয় দেখা যায়। বেশিরভাগ আসনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা তফসিল ঘোষণার আগে থেকে একচ্ছত্রভাবে প্রচারণা শুরু করে, অনুমোদিত সময়ের প্রচারণার ক্ষেত্রেও তাদের এই একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষণীয়। এছাড়া কোনো কোনো আসনে প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে তারা সরাসরি প্রচারণার জন্য সুবিধা নিয়েছে; সার্কিট হাউজ/ডাক-বাংলো/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে। কোনো কোনো আসনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

অন্যদিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৪টি আসনে (ছয়টি আসনের তথ্য পাওয়া নি) সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের নামে মামলা, পুলিশ/ প্রশাসন কর্তৃক হুমকি/ হয়রানি, প্রার্থী/ নেতা-কর্মী গ্রেফতার অব্যাহত ছিল। এসব আসনে ১২,৬৮৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, যাদের মধ্যে ৩,৭৩৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ও কর্মী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভয়-ভীতি দেখানো, গ্রেফতার হওয়া ও মামলা থাকার কারণে বিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীরা প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো আসনেই প্রার্থীদের কোনো না কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। অনুমোদিত সময়ে প্রচারণার ক্ষেত্রে যেসব আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রার্থীর

---

[৯৮] হারুন আল রশীদ, 'দেশি পর্যবেক্ষক অস্বাভাবিক কম, বিদেশি হাতে গোনা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) মাধ্যমে এনফ্রেলকে অর্থায়ন করে থাকে।

[৯৯] *প্রাগুক্ত*।

[১০০] *ডেইলি স্টার*, 'ক্যাম্পেইনিং এন্ডস: অ্যান্ড দ্যা ইসি'স রোল স্টিল রিমেইনস ক্রুশিয়াল', ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১০১] *দৈনিক প্রথম আলো*, "নিয়ন্ত্রণমূলক নির্বাচনী পরিবেশ' নিয়ে উদ্বেগ', ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১০২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশের নির্বাচনে ভীতিহীন পরিবেশ নিশ্চিতের আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের', ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১০৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন দি হাউস অব কমন্স লাইব্রেরি, *বাংলাদেশ: নভেম্বর ২০১৮ আপডেট*, ব্রিফিং পেপার, নম্বর ৮৪৪৮, ২৯ নভেম্বর ২০১৮। www.parliament.uk/commons-library

(৫৮.৮৮%) ক্ষেত্রে যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসভা বা শোভাযাত্রা করতে দেখা গেছে। এছাড়া দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো (৫৭.০১%), নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারকে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান (৫১.৪০%), পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা (৪৭.৬৬%), প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক ক্যাম্প/অফিস স্থাপন (৪৪.৮৬%), ভোটের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা (৪২.০৬%), পোস্টারে মুদ্রণ সংখ্যা, প্রেস/প্রিন্টার্সের নাম, ফোন নম্বর না দেওয়া (৩৯.২%), নির্ধারিত সময়ের (দুপুর ২টা - রাত ৮টা) বাইরে প্রচারণা চালানো (৩৮.৩২%), মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন (৩৭.৩৮%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য)।

বক্স ১: নির্বাচনী প্রচারে বাধা ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের

"জলে বাস করে কুমিরের সাথে লড়াই করা যায় না। এখানে নৌকা ছাড়া অন্য কোনো প্রতীকের নাম নেওয়া যাবে না। আমরা সাধারন জনগণ নিজেরা কাজ না করলে পেটে ভাত যায় না, ন্যায় কথা বলে দু'মুঠো কাজ করে খেতেও পারবো না। আমাদের থাকতে হবে জেলে আর বাড়িতে ছেলে মেয়ে না খেয়ে মরবে। এজন্য আমাদের কোনো কথা নেই। ক্ষমতা যার বেশি সে তার মত করে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে আমরা শুধু চেয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার নেই। আপনি সারা দিন এলাকা ঘুরে দেখেন সবার সাথে কথা বলেন সবাই বলবে নির্বাচন ভাল চলছে কেউ আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কথা বলবে না। আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কথা বলে কেউ এখানে ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করতে পারবে না। এলাকায় যারা বিএনপি আছে তারা জানে তারা যদি মাঠে প্রচারণা করতে নামে তাহলে তাদের কে জেলে থাকতে হবে। এজন্য সবাই নীরব হয়ে আছেন, কেউ আত্মপ্রকাশ করছে না। কয়েকজন পোস্টার লাগাতে শুরু করছিলো তবে তাদেরকে লাগাতে দেয়নি আওয়ামী লীগের ছেলেরা।"

- একটি আসনে জনৈক এলাকাবাসী

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে প্রার্থীদের আচরণ বিধি লঙ্ঘন বিশ্লেষণ করলে আরও লক্ষ করা যায় যে ক্ষমতাসীন জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর প্রার্থীদের মধ্যে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা অনেক বেশি, যেখানে অন্যান্য সরকার-বিরোধী দল, যেমন বিএনপি বা গণফোরামের প্রার্থীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬০% আসনে প্রতিপক্ষের প্রার্থীরা মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকেই নিজ এলাকায় ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ও কর্মী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভয়-ভীতি ও হামলার শিকার হওয়ার অভিযোগ করেন। গ্রেফতার হওয়া এবং মামলা থাকার কারণে প্রচারণা চালাতে পারে নি বলে অভিযোগ করে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা ও সমর্থক স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি খোলাখুলিভাবে ক্ষমতাসীন দলকে ভোট না দেওয়ার ফলাফল সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে দেখা যায়।

বক্স ২: ক্ষমতাসীন দলের মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য হুমকি

"আমাদের দল ক্ষমতায় তাই আমাদের নৌকায় ভোট দিন। আমরা এমনিতেই জিতবো। তাই সবাইকে বলছি যারা নৌকায় ভোট দিবেন না তাদের খবর আছে।"

- একটি আসনের একটি উপজেলায় পথসভায় জনৈক উপজেলা চেয়ারম্যান

"জামাত-বিএনপি প্রার্থীর অনুসারীদের তালিকাভুক্ত করতে হবে। নির্বাচনের দিন বিএনপি'র লোকদের বের করে দিয়ে নিজেদের ভোট দিতে হবে। বিরোধী দলের মানুষকে যদি মারতে হয়, সেই ব্যবস্থা করা হবে। নৌকা ছাড়া আর কোনো ভোট যাতে না পড়ে সেজন্য কেন্দ্রে ও ভোট কক্ষে পর্যাপ্ত লোকের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে পর্দার ভেতরে আমাদের লোক থাকবে, তার সামনে সবাই সিল মারবে। না মারলে জোর করে মারাতে হবে।"

- একটি আসনে জনৈক উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি

অনুমোদিত সময়ে প্রচারণাকালে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩১% এলাকাতে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী/সমর্থক কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট ইত্যাদির ওপর পোস্টার বা লিফলেট লাগানো এবং কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন (ক্যাম্প/প্রচারণা সামগ্রী নষ্ট করা/পুড়িয়ে দেওয়া, প্রচার-প্রচারণায় বাধা দেওয়া, হামলা, প্রচার চালাতে আসলে কর্মী/সমর্থকদের মেরে তাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি) এবং অনভিপ্রেত গোলোযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা এলাকায় শান্তিভঙ্গের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে লক্ষণীয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৬টি আসনে বিরোধীদলের প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে দেখা যায়।

নির্বাচনের চারদিন আগে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান দুইটি প্রতিপক্ষ দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটি জনসভার মাঠে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। একটি সরকারি কলেজের মাঠে প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে ক্ষমতাসীন

দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনসমাবেশের আয়োজন করে এবং এলাকায় সেই জনসভার প্রচারণাও চালায়। জনসভার নির্ধারিত দিনে নেতা-কর্মীরা সেই স্থানে জনসভার প্রস্তুতি করতে গেলে প্রশাসন থেকে বাধা দেওয়া হয়। তখন প্রার্থী নিজে পুনরায় প্রশাসন থেকে অনুমতি নিয়ে আসেন এবং নেতাকর্মীরা একই স্থানে জনসভার প্রস্তুতি নিতে যায়। সেই সময় কলেজের পেছন দিক থেকে একদল নারী-পুরুষ লাঠি হাতে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে মিছিল করতে করতে মাঠে আসে এবং প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের মারতে শুরু করে। এরপর কলেজের সামনের দিক থেকে প্রার্থীর ছেলে বিশাল একটা মিছিল নিয়ে মাঠে এসে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকদের ধাওয়া করেন। প্রতিপক্ষের ব্যানার ছিঁড়ে ও জনসভার চেয়ার ভেঙ্গে ফেলে এবং কিছু সমর্থকে ধাওয়া করে মেরে আহত করে। এরপর প্রতিপক্ষের সকল সমর্থককে মেরে মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়ে তারা মাঠে মিছিল শুরু করে। পুলিশের সামনেই এসব ঘটনা ঘটলেও পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। কিছু বিজিবি সদস্য সেখানে থাকলেও তারাও কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা প্রতিপক্ষের গাড়ি মনে করে বিজিবি'র গাড়ি ভাংচুর করে। ঐ সময় সংশ্লিষ্ট ডিএসপি কলেজ মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, "এখানে হাজারো লোক। আমরা কী করতাম, এগুলো কোনোভাবেই ঠেকানো যেতো না।"

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছয়টি আসনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের কারণে প্রশাসন কর্তৃক প্রার্থী/ সমর্থক/কর্মীদেরকে জরিমানা করতে দেখা যায়। একটি আসনের একটি পৌর এলাকার একটি ওয়ার্ডে পাশাপাশি দুইটি ক্যাম্প পরিচালনা এবং রঙিন প্রতীক প্রদর্শন করার জন্য ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে ৫০০০ টাকা জরিমানা করেন। এই একই আসনে বড় হর্ন মাইক ব্যবহার করা এবং রঙিন ব্যানার টানানোর জন্য ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে ১৪,০০০ টাকা এবং প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীকে ৫,০০০ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত। অন্য একটি আসনের একটি ইউনিয়নে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকের সাথে বাক-বিতন্ডা এবং ক্ষমতাসীন দলের পোস্টার ছিঁড়ে আগুন লাগানোর এক পর্যায়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিপক্ষ দলের সমর্থককে ৩০,০০০ টাকা জরিমানা করেন। আরও দুইটি আসনের একটিতে মোটর সাইকেলে শোডাউন করার জন্য জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে ১০,০০০ টাকা এবং অন্যটিতে গাড়িবহর নিয়ে প্রচারণার জন্য প্রার্থীকে ২০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া আরেকটি আসনে মোটরসাইকেলে পোস্টার লাগিয়ে শোডাউন করায় প্রার্থীকে ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।[১০৪]

শুধুমাত্র মূলধারার রাজনৈতিক দল/জোট নয়, স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জরিমানার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তার মধ্যে প্রচারণার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে মাইকিং করার জন্য একজন প্রার্থীকে ১,৫০০ টাকা, নির্ধারিত সাইজের চেয়ে বড় আকারের ব্যানার টানানোর জন্য আরেকজন প্রার্থীকে ২,০০০ টাকা, গাড়িতে পোস্টার লাগিয়ে প্রচারণা করার দায়ে ভ্রাম্যমান আদালত প্রার্থীকে ২,০০০ টাকা জরিমানা করে। একটি আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পোস্টারে ও অন্যান্য প্রচারণা সামগ্রীতে দলনেতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রীর ছবি এবং বিএনপি'র প্রার্থীর পোস্টারে দলীয় প্রধানের ছবি ব্যবহার করায় চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়। এক্ষেত্রে অন্য একটি আসনের জাতীয় পার্টির একজন প্রার্থীকে ৮,০০০ টাকা জরিমানাও করা হয়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনী প্রচারণার বিভিন্ন সময়ে সহিংসতা ঘটনা লক্ষ করা গেলেও ২২% আসনে প্রশাসন/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে প্রতিপক্ষ প্রার্থী/সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ক অভিযোগের বিপরীতে কোনো প্রতিকার না পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো এলাকায় প্রার্থীদের ওপর হামলা ও অপহরণের চেষ্টা, প্রার্থীর প্রচারণার গাড়ি বহরে হামলা ও ভাঙচুর, বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের বাসায় হামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শনের পাশাপাশি বাড়িঘর লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

একাদশ নির্বাচনে প্রার্থীদের বৈধতা চূড়ান্তকরণ বিষয়টি ছিল আলোচিত এবং উল্লেখযোগ্য একটি দিক। সরকারবিরোধী দলের অনেক প্রার্থীর বৈধতা নিয়ে মামলার রায়, আপিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে কিছু কিছু আসনে প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রার্থীর পক্ষ হয়ে প্রচারণার সময় খুব সীমিত ছিল। এছাড়া মামলা, গ্রেফতার ও হয়রানির ভয়ে সরকারবিরোধী দলের প্রার্থী/সমর্থকদের জোরালো প্রচারণার ঘাটতি ছিল এমন অভিযোগ পাওয়া যায়। সরকারবিরোধী দলের সমর্থকরা নির্বাচনী প্রচারণায় এগিয়ে না আসার কারণ হিসেবে একটি আসনে জনৈক দলীয় কর্মী বলেন "কী লাভ শুধু শুধু নিজেদের ঝামেলায় জড়ানো, নির্বাচিত হতে পারলে একটা কথা ছিল, যার জন্য কাজ করব নির্বাচনের পরে তো সে (প্রার্থী) চলে যাবে ঢাকায় এখানে তো আমাদের থাকতে হবে, জলে বাস করে কুমিরের সাথে ঝগড়া করতে চাই না।" তবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৩% আসনে সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীদের প্রচারণা চালানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকতে দেখা যায়।

কোনো কোনো প্রার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রচারণার উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ২০ জন প্রার্থীকে নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীর দলীয় এবং ব্যক্তি পরিচয়-সংবলিত গান রেকর্ডিং করে প্রচার করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, একক প্রার্থীর প্রচারণায় গান বা অডিও রেকর্ডিং সংগঠন এবং প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচে হয়ে

[১০৪] উল্লেখ্য, নির্বাচনী কাজে অবহেলার অভিযোগে ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর একজন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক (ডিসি), একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) ও চারজন ওসিকে (থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচনী কাজে অবহেলার অভিযোগে ডিসি-এডিসি ও চার ওসি প্রত্যাহার', ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

থাকে। সংগঠনের ক্ষেত্রে হলে সংগঠনের সাথে জড়িত শিল্পীদের মাধ্যমে করানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণত শিল্পীদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় না বরং পরিচয়ের মাধ্যমে করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিল্পীর তুলনামূলক চাহিদার ওপর নির্ভর করে অডিও গান রেকর্ডিং-এর খরচ ৫০ হাজার টাকা থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে অডিও গান রেকর্ডিং করা হয়। এক্ষেত্রে অডিও গান রেকর্ডিং এর জন্য ১৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়।

নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি: প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণার সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সর্বাধিক ৭৯.৫% স্থানীয় যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন যেমন রাস্তা, রেলপথ, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (৪৪.৩%), মাদক ও সন্ত্রামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা (৩৭.৫%), শিক্ষার উন্নয়ন করা (৩৬.৪%), এবং স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন (২৩.৯%) উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ১৫.৯% প্রার্থী।

সারণি ১৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত	৭০	৭৯.৫
কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত	৩৯	৪৪.৩
মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন সংক্রান্ত	৩৩	৩৭.৫
শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত	৩২	৩৬.৪
স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত	২১	২৩.৯
সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত	১৪	১৫.৯
কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত	৭	৮
রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করা (গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বাক-স্বাধীনতা রক্ষা, সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি)	৭	৮
নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করা	৪	৩.৭
অন্যান্য*	১২	১১.২

* অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করা, খাস জমি বিতরণ ব্যবস্থা করা, খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন করা, সুদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থা চালু করা, সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা।

প্রার্থীদের প্রচারণার ব্যয়: মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৪ জন প্রার্থী গড়ে ৭৪ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৮ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫০ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা, এবং আরেকটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২,৫০০ টাকা ব্যয় করেছেন বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭.৯% প্রার্থী।

সার্বিকভাবে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) তিনগুণের বেশি (সারণি ১৫ দ্রষ্টব্য)। তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৮.৯% প্রার্থী।

সারণি ১৫: তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

রাজনৈতিক দল	প্রার্থীর সংখ্যা	তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা)
আওয়ামী লীগ	৪১	৭,৫২,৮০১	৪,০০,৮৩২	১,২৩,৭৭,১৩০	১,৩৩,৬৫,৫১৫
বিএনপি	৪৩	৩,৫৮,৪১০	৯৬,৯৮৯	২৮,০৪,৯৯০	২৭,৮৫,১২২
জাতীয় পার্টি	৮	৫৫,৯৭৫	৫৮,৩২৫	৬২,৬০,১৯৮	৬৩,৪৬,৫১১
গণ ফোরাম	৫	-	৫৬,০০০	৪০,৭৯,৫৮০	৪১,৩৫,৫৮০
স্বতন্ত্র	৩	৭,৮৭০	১,৭৭,৬৬৬	১৪,২৩,৯০৫	১৬,০৪,১৯৫
অন্যান্য*	৭	১,৭৭,৩৬০	১,২৩,০১৪	১,২১,৫৮,১৭১	১,২৪,০৭,৮৭১
মোট	**১০৭**	**৫,৫৩,৬৯৮**	**২,১৪,৭৭৫**	**৭৪,৯৫,৩৮৮**	**৭৭,৬৫,০৮৫**

* অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পার্টি (জেপি), এলডিপি, জেএসডি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা (গড়ে এক কোটি ৩৩ লাখ ৬৫ হাজার ৫১৬ টাকা যা নির্ধারিত ব্যয়সীমার পাঁচগুণের বেশি), এবং সবচেয়ে কম ব্যয় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা (গড়ে ১৬ লাখ ৪ হাজার ১৯৫ টাকা)। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী (চার কোটি ৫৫ লাখ ৬৯ লাখ ৫০০ টাকা)। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, নির্বাচনী ক্যাম্প, জনসভা, এবং কর্মীদের জন্য ব্যয়। প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছেন ব্যবসায়ী (৫৭ জন), যাদের গড় ব্যয় ৮০ লাখ ১১ হাজার ৬৪৩ টাকা (পরিশিষ্ট ২ দেখুন)। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সংক্রান্ত টিআইবি'র গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায় তিনগুণ ব্যয় করেছিলেন - নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমা যেখানে ছিল আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা, প্রার্থীরা ব্যয় করেছিলেন গড়ে ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা।

সারণি ১৬: দল অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যয় (টাকা)

	আওয়ামী লীগ (৪১ জন)	জাতীয় পার্টি (৮ জন)	বিএনপি (৪৩ জন)	গণ ফোরাম (৫ জন)	স্বতন্ত্র (৩ জন)	অন্যান্য (৭ জন)
গড় ব্যয়	১,৩৩,৬৫,৫১৬	৬৩,৪৬,৫১১	২৭,৮৫,১২৩	৪১,৩৫,৫৮০	১৬,০৪,১৯৫	১,২৪,০৭,৮৭১
সর্বনিম্ন ব্যয়	১৬,৩৯,১৮৫	১১,৮১,০০০	৬৫,০০০	২,৭৬,৫০০	৫,৭৭,৪১৫	৪৭,৫০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	৪,০৫,৭৫,৫০০	১,৬০,৫৮,৯০০	২,০৯,২৭,৫০০	৯৬,০৩,৩০০	২৬,২৪,৭৭০	৪,৫৫,৬৯,৫০০

দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নারী প্রার্থীদের গড় ব্যয় (৯৮ লাখ ৪৭ হাজার ৪২৭ টাকা) ছিল পুরুষ প্রার্থীদের তুলনায় অনেক বেশি (৭৬ লাখ ৬৩ হাজার ৯ টাকা)। আবার সর্বোচ্চ ব্যয়ের দিক থেকে একজন পুরুষ প্রার্থী ছিলেন সবার চেয়ে বেশি (সারণি ১৭)।

সারণি ১৭: লিঙ্গভিত্তিক নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)

	পুরুষ প্রার্থী (১০২ জন)	নারী প্রার্থী (৫ জন)
গড় ব্যয়	৭৬,৬৩,০০৯	৯৮,৪৭,৪২৭
সর্বনিম্ন ব্যয়	৪৭,৫০০	৩,২৭,৭০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	৪,৫৫,৬৯,৫০০	৩,৫৭,৫১,৭০০

আবার দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের গড় ব্যয় অন্যান্য দলের প্রার্থীদের তুলনায় বেশি হলেও সর্বোচ্চ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্য দলের প্রার্থীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ব্যয় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। অন্যদিকে কৃষিজীবী হিসেবে পেশা উল্লেখ করেছেন এমন দুইজনের গড় ব্যয় সবচেয়ে বেশি, যেখানে কেবল গৃহকর্মের সাথে জড়িতদের গড় ব্যয় নির্ধারিত সীমার মধ্যেই ছিল (পরিশিষ্ট ৩ দেখুন)।

প্রচারণার ধরন অনুযায়ী দেখা যায় প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রাচরণায় সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন কর্মীদের পেছনে। প্রার্থীরা এই খাতে গড়ে ২৮ লাখ ৫২ হাজার ৯৪২ টাকা ব্যয় করেছেন। এছাড়া নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা (গড়ে ২০ লাখ ৯৫ হাজার ১৪ টাকা), জনসভা (গড়ে ১৩ লাখ ৯০ হাজার, ৪৬৮ টাকা), র‍্যালি/ মিছিল (গড়ে ৭ লাখ ৭১ হাজার ৬৪৩ টাকা), জনসংযোগ (গড়ে ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৩২৯ টাকা), এবং পোস্টার ও স্টিকার ছাপানোর (গড়ে ৬ লাখ ১ হাজার ৭৯৫ টাকা) জন্য ব্যয় করেন। উল্লেখ্য, ১১ জন প্রার্থী কোনো ধর্মীয়, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চাঁদা হিসেবে গড়ে ১ লাখ ৯৩ হাজার ১৮২ টাকা দিয়েছেন, যা আচরণ বিধি অনুযায়ী বৈধ ছিল না (পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

সারণি ১৮: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন	আসন (সংখ্যা)
প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নীরব ভূমিকা	৪২
জাল ভোট দেওয়া	৪১
নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা	৩৩
বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট	৩০
পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া*	২৯
ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া	২৬
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	২৬
ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া	২২
আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো	২১
ব্যালট বাক্স আগে থেকে ভরে রাখা	২০
প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীর নেতা-কর্মীদের মারধর করা	১১

* এর মধ্যে ২৯টি আসনে পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, ১০টি আসনে কোনো এজেন্ট ছিল না।

৪.৩ নির্বাচন অনুষ্ঠান

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনের দিন গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনের মধ্যে ৪৭টি আসনে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনার অভিযোগ পাওয়া যায়। সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, ভোটার ও সংশ্লিষ্ট আসনে পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এসব আসনে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নীরব ভূমিকা, জাল ভোট দেওয়া, নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা, নির্বাচনের দিন বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট, পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়ম সংঘটিত হয় (সারণি ১৮)।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি আসনে একটি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। হঠাৎ দুপুর দুইটায় ঐ থানার উপ-পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি পুলিশের দল ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ করে। এতে আতঙ্কিত হয়ে সবাই পালিয়ে যায় এবং ১০ জন গুলিবিদ্ধ হন। আরেকটি কেন্দ্রে দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে পুলিশ। আতঙ্কিত হয়ে সবাই চলে গেলে সেখানে ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকে। অন্য একটি আসনে একটি কেন্দ্রের একজন পোলিং এজেন্ট জানান যে তিনি সকালে তার কেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পান যে সেই কেন্দ্রের ব্যালট বাক্স আগে থেকে ভরা, এ বিষয়ে তিনি জানতে চাইলে তার দায়িত্ব পরিবর্তন করে অন্য বুথে দেওয়া হয়।

বক্স ৩: প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় নির্বাচনে ভোট কারচুপি

"কেন্দ্র-সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নির্বাচনের আগের রাতে বলেন যে এই কেন্দ্রের ৪০% ভোট রাতেই কাস্ট করে রাখতে হবে। আপনি ব্যালটের ১০টা বান্ডেল দেন। এই এসআই আর কয়েকজন কর্মী ব্যালটে রাতে সিল মেরে রাখবে। বাধ্য হয়ে আমি ১০টা বান্ডেল তাদের হাতে দিলাম। ওরা একটু অন্যমনস্ক থাকায় ১০টার মধ্যে ২টা বান্ডেল আমি সরিয়ে ফেলি। আমি আমার নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যালটের পিছনে সিল এবং সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের সই লাগবে বললে তারাই সেই সই করতে থাকেন এবং ব্যালটের মুড়িতে ভোটারদের বদলে কর্মীরাই টিপসই দেন। তারা ঐ সিল মারা ব্যালট বাক্সে ঢোকাতে চাইলে আমি বাধা দেই এবং সফল হই। কিন্তু পরদিন সারাদিনে বুথের পুলিশ কর্মী এবং ক্ষমতাসীন দলের এজেন্ট ও কর্মীরা সিল দেওয়া ব্যালটগুলো বিভিন্ন সময়ে বাক্সে ফেলেছে। নির্বাচনের দিন আমার কেন্দ্রে ১৫০০ ভোট কাস্ট হয় যার ৮০০টিই ছিল আগের রাতের সিল মারা ব্যালট। পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাকে নিজে বলেন যে অন্য কোনো দলের এজেন্ট আসবে না, আর ভোটারদের সবাইও আসবে না।

এসব অনিয়মের বিষয়ে লিখিতভাবে জানানোর প্রক্রিয়া ছিল না। শুধু সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার ফোন নম্বর ছিল, যেখানে জানালেও তিনি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। কোনো নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এই কেন্দ্রে আসেনি। একজন সাংবাদিক এলেও পুলিশের এসআই তার সাথে থাকায় তাকেও আমি কিছু জানাতে পারি নি। কেন্দ্রের বাউন্ডারির মধ্যে ভোটারদের ঢুকতে দিতে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা বাধা দেয়।

নির্বাচন কমিশন যদি চায় এই জাল ভোট এখনো ধরতে পারে। যতগুলো জাল ভোট পড়েছে সেখানের ব্যালটে কোনো ভোটারের সিরিয়াল নম্বর নেই, ব্যালটের পিছনের সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের সই আর ঐ কেন্দ্রের সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের সই কোনোভাবেই মিলবে না - এগুলো চেক করলেই ধরা সম্ভব। আমি এমন অনেক কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের সাথে কথা বলেছি যারা বলেছে অনেক কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারদের ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা এবং সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারদেরকে পাঁচ হাজার টাকা করে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।"

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি আসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার, জানুয়ারি ২০১৯

উল্লেখ্য, নির্বাচনের দিন সারা দেশের ২৪ জেলায় নির্বাচনী সহিংসতার ফলে ১৮ জনের প্রাণহানি ঘটে, এবং ২০০ জন আহত হয়। মৃতদের মধ্যে আটজন আওয়ামী লীগ ও চারজন বিএনপি'র কর্মী ছিল বলে দাবি করা হয়। মোট ২২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[১০৫] সারাদেশে বেশিরভাগ কেন্দ্র আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের দখলে থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বেশিরভাগ কেন্দ্রে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না, অথবা সকালে তাদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে ছিল ধীরগতিতে ভোট গ্রহণ, ভোটকেন্দ্র দখল করে ভোট দেওয়া, ভোটারদের নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি।[১০৬] নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে ৭৬ জন

---

[১০৫] *ডেইলি স্টার*, '১৮ ডেড, ২০০ হার্ট', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১০৬] সোহরাব হাসান, 'দেখা ভোট, শোনা ভোট, না দেখা ভোট', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *ডেইলি স্টার*, 'ইরেগুলারিটিজ ওয়াশ আউট অপটিমিজম', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *ডেইলি স্টার*, 'অ্যাজ উই স', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; এম সাখাওয়াত হোসেন, 'নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে অতি উৎসাহীদের কারণে', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; কামাল আহমেদ, 'অনিয়মের অভিযোগ কম নয়', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

প্রার্থী নির্বাচন চলাকালীন ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। ঐক্যফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরে পুনরায় নির্বাচন গ্রহণের দাবি উত্থাপন করা হয়।[১০৭]

তবে এসব অভিযোগ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি করে হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী "কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি ভালো"। অন্যদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক' ছিল। পরবর্তী সময়ে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে বক্তব্য দেওয়া হয়। কমিশনের ফলাফল পরিবেশন কেন্দ্রে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব বলেন, সারাদেশে ২৯৯টি নির্বাচনী এলাকার ৪০ হাজার ১৮৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে গোলযোগ ও অনিয়মের কারণে ২২টি কেন্দ্র স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে, ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারাদেশে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।[১০৮] প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা ভোটে কোনো অনিয়ম হয়নি বলে দাবি করেন, এবং ভোট নিয়ে "তৃপ্ত-সন্তুষ্ট", এবং তাঁরা "লজ্জিত নন" বলে জানান। আগের রাতে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ বিষয়ে তিনি বলেন, "অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।"[১০৯] "ধানের শীষের এজেন্ট না এলে কী করার?" বলেও তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন।[১১০]

পরে ২০১৯ সালের ৮ মার্চ উপজেলা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইভিএম ব্যবহারের যৌক্তিকতা তুলে ধরার সময় বলেন যে ইভিএম ব্যবহার করলে নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে অনিয়ম ও ভোট কারচুপির অভিযোগ তিনি স্বীকার করেছেন কিনা তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। তার আগে ৬ মার্চ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সামনে রেখে সুনামগঞ্জে বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা সভায় প্রধান অতিথি নির্বাচন কমিশনার শাহাদাত হোসেন চৌধুরী বলেছিলেন যে তিনি নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরা কিংবা ভোটের দিন, ভোটের পর গণনার সময় কোনো অনিয়ম মেনে নেবেন না।[১১১]

গবেষণাভুক্ত আসনের নির্বাচনী ফলাফল: গবেষণাভুক্ত আসনগুলোতে মোট ভোটারের কত শতাংশ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন সেই তথ্য পাওয়া যায় নি।[১১২] নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে আওয়ামী লীগ ৪০, জাতীয় পার্টি ৬, বিএনপি ১, গণ ফোরাম ২, এবং অন্যান্য দল একটি আসনে জয়ী হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচজন নারী প্রার্থীর মধ্যে একজন নারী প্রার্থী নির্বাচিত হন। তিনি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। জাতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ২৫৭, জাতীয় পার্টি ২২, বিএনপি ৫, গণ ফোরাম ২, স্বতন্ত্র ৩, এবং অন্যান্য দল নয়টি আসনে জয়ী হয়।[১১৩]

সারণি ১৯: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের দলগত পরিচয়

দল	বিজয়ী প্রার্থী	
	সংখ্যা	শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	৪০	৮০
জাতীয় পার্টি	৬	১২
বিএনপি	১	২
গণ ফোরাম	২	৪
অন্যান্য	১	২
মোট	**৫০**	**১০০**

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে জয়ী প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ২৭ লাখ ৩৩ হাজার ৮৭৭ টাকা ব্যয় করেছেন বলে প্রাক্কলিত হয়েছে। এর মধ্যে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৬৯ হাজার ৫০০ টাকা, এবং আরেকজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২ লাখ ৮৬ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয় করেছেন।

---

[১০৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ফলাফল প্রত্যাখ্যান, পুনর্নির্বাচনের দাবি ঐক্যফ্রন্টের', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১০৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ: ইসি সচিব', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১০৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'আমরা তৃপ্ত-সন্তুষ্ট, লজ্জিত নই: সিইসি', ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১১০] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ধানের শীষের এজেন্ট না এলে কী করার: সিইসি', ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১১১] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'তাহলে কি আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরে যায়', ৯ মার্চ ২০১৯।
[১১২] তবে সার্বিকভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে মোট ভোটারের ৮০% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ১৮৬টি আসনে ভোট পড়ে ৮০ শতাংশের বেশি, যার মধ্যে ১৩টি আসনের ভোট ৯০ শতাংশেরও ওপরে। অন্যদিকে ৫০ শতাংশের নিচে ভোট পড়ে তিনটি আসনে। ৮০ শতাংশের নিচে ভোট পড়ে ১১২টি আসনে। ৫০ শতাংশের নিচে যেসব আসনে ভোট পড়েছে (খুলনা ২ আসনে ৪৯.৪১%, ঢাকা ৬ আসনে ৪৫.২৬% ও ঢাকা ১৩ আসনে ৪৩.০৫%), সেসব আসনে ইভিএমে ভোট হয়েছে। তথ্যসূত্র: হারুন আল রশিদ, '১৮৬ আসনে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০১৯।
[১১৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নিরঙ্কুশ জয়ে নতুন রেকর্ড গড়ছে আ.লীগ', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

৪.৪ উপসংহার

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই অনেক বিতর্ক থাকলেও নির্বাচন কমিশনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জোটের সংলাপ, ক্ষমতাসীন দলের সাথে প্রধান কয়েকটি দল নিয়ে গঠিত জাতীয় ঐক্যজোটের সংলাপ, এবং এর প্রভাবে প্রধান বিরোধী জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের একচ্ছত্র আধিপত্য, প্রতিপক্ষ দলের নেতা-কর্মী, প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, প্রতিপক্ষের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় হামলা, বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া, বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনের দিন দলীয় প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় জাল ভোট দেওয়া, বুথ দখল, আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরে রাখা, ভোট কেন্দ্রে ভোটার এবং প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয়সমূহ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রার্থীদের একটি বড় অংশই প্রচারণার সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন যা গড়ে তিনগুণের বেশি।

অধ্যায় পাঁচ

নির্বাচন-পরবর্তী সময়

এ অধ্যায়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচন-পরবর্তী সময়ের কার্যক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রার্থী ও দলের নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন দাখিল, নির্বাচনী অভিযোগের তদন্ত, এবং নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তি। তবে শেষের দুইটি কার্যক্রমের জন্য দীর্ঘ সময় লাগার কারণে এ প্রতিবেদনে তা নিয়ে আলোচনা সংগত কারণে সম্ভব হয় নি।

৫.১ নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোট, যাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, সিপিবি, খেলাফত মজলিস, বাসদ, গণ সংহতি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য।[১১৪] পুলিশ-র‍্যাবের সহায়তায় সারা দেশে ভোট ডাকাতির মহোৎসব হয়েছে বলে অভিযোগ করে ভোট বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন দেওয়ার দাবিও জানায় কোনো কোনো দল। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট স্মারকলিপি প্রদান করে ২০১৯ সালের ৩ জানুয়ারি।

এই স্মারকলিপিতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় সরকারদলীয় ব্যক্তিদের 'ভোট ডাকাতি' ও 'তাণ্ডব' হয়েছে - এ অভিযোগসহ মোট ১৭টি অভিযোগ উল্লেখ করা হয়। এসব অভিযোগের মধ্যে নির্বাচনের আগের রাতে দেশে ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করে ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভরে রাখা, ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের যেতে বাধা প্রদান ও ভয় দেখানো, পোলিং এজেন্টদের ভয় দেখানো, কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়াসহ কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া ও মারধর, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় জাল ভোট দেওয়া ও ভোটারদের নৌকায় সিল মারতে বাধ্য করা, বেআইনিভাবে মধ্যাহ্নবিরতি, জুডিশিয়াল ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্বাচনী দায়িত্বে নিষ্ক্রিয় রাখা, অনেক ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট কাস্ট, পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মীদের দেখানোর জন্য অন্য এলাকা থেকে লোক এনে লাইনে দাঁড় করানো, আওয়ামী লীগের পদধারী নেতাদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ, এবং এসব অনিয়মে নির্বাচন কমিশনের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রায় প্রতিটি অভিযোগেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করা হয় এবং এই বাহিনীর কাছ থেকে তাঁরা প্রতিকার পাননি বলে অভিযোগ করেন। তাঁদের অভিযোগ অনুযায়ী এই বাহিনী হামলা-মামলায় অংশ নিয়েছিল। এ ছাড়া সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার অভিযোগ এনে সেনাবাহিনী নামার পর বিএনপি/ ঐক্যফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন, হামলা-মামলা বেড়ে যায় বলেও ঐক্যফ্রন্ট দাবি করে।[১১৫] ঐক্যফ্রন্টের পর ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগও একটি স্মারকলিপি দিয়ে বলে ঐক্যফ্রন্টের অভিযোগ সত্য নয়। ঐক্যফ্রন্টের দাবির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন একটি বৈঠকে আলোচনা করে নির্বাচন বাতিল এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করার কোনো সুযোগ নেই বলে সিদ্ধান্ত নেয়, এবং সংক্ষুব্ধ হলে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে গিয়ে মামলা করার পরামর্শ দেয়।[১১৬]

নির্বাচনের পর প্রথম বাম গণতান্ত্রিক জোট 'ভোট ডাকাতি, জবর দখল ও অনিয়মের নানা চিত্র' শীর্ষক একটি গণশুনানি আয়োজন করে ২০১৯ সালের ১০ জানুয়ারি, যেখানে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে একটি কলঙ্কিত নির্বাচন আখ্যা দেওয়া হয়। একাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া বাম দলগুলোর প্রার্থীরা এই শুনানিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অভিযোগ তুলো ধরেন। নজিরবিহীন ভুয়া ভোটের এই নির্বাচনের আগের দিনই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রশাসনের সহায়তায় ভোট ডাকাতি হয়েছে, এবং নির্বাচনের দিন প্রশাসন এসব অনিয়ম ঠেকাতে নিষ্ক্রিয় ছিল বলে তাঁরা অভিযোগ করেন।[১১৭] আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের কোনো কোনো শরিক দলও ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে গুরুতর অভিযোগ করে, যাদের মধ্যে ছিল জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), জাসদ (শরীফ নূরুল আম্বিয়া), জাসদ (ইনু)।

---

[১১৪] *দৈনিক যুগান্তর*, 'নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১১৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ইসিতে ঐক্যফ্রন্টের যেসব অভিযোগ', ৩ জানুয়ারি ২০১৯।

[১১৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ঐক্যফ্রন্টের দাবি আমলে নিল না ইসি', ১৪ জানুয়ারি ২০১৯।

[১১৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচনকে 'কলঙ্কিত' বলল বাম জোট', ১১ জানুয়ারি ২০১৯। এবারের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩১টি আসনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ১৪৭ জন প্রার্থী অংশ নেয়। এই গণশুনানি অনুষ্ঠানে বাম দল থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া ৮০ জন প্রার্থী তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় ভোটের সময়কার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি এবারের জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-১২ আসন থেকে কোদাল মার্কায় দাঁড়ান। গণশুনানিতে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের আগের দিন রাতেই কেন্দ্রভেদে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে ফেলা হয়েছে। আমরা যারা প্রার্থী ভোট দিতে গিয়েছিলাম, দেখেছি, একটা ভোটকেন্দ্রে ভোটারের তেমন কোনো ভিড় নেই অথচ নয়টা বা সাড়ে নয়টার মধ্যেই ব্যালট বাক্স ভরে গেছে।'

এরপর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের 'অনিয়ম' নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের গণশুনানিতে বিভিন্ন অভিযোগ করেন ৪১ জন প্রার্থী। প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী প্রচারে বাধা দেওয়া, গায়েবি মামলা, নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার, এজেন্ট ঢুকতে না দেওয়া, কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। সবার বক্তব্যে ভোটের আগের রাতে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি দলের প্রার্থীদের পক্ষে সিল মারার অভিযোগ এসেছে।[১১৮]

বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী 'পর্যবেক্ষক'রা নির্বাচন "অংশগ্রহণমূলক" হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণ-মাধ্যমে নির্বাচনে অনিয়মের সমালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনের ভোট গ্রহণ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ভারত, নেপাল, সার্ক ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) নির্বাচনী পর্যবেক্ষকেরা। তাঁদের মতে, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ভোট শেষ হয়েছে।[১১৯]

অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের খবর নিয়ে বিশ্বের প্রায় বড় বড় সব গণমাধ্যম ফলাও করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি ব্যাপক অনিয়মের চিত্রও প্রকাশ করা হয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিবিসি নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করে। বিবিসির প্রতিবেদক একটি কেন্দ্রে নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই বাক্সে ব্যালট পেপার ফেলা হচ্ছে তা এমনটা প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সিএনএনের খবরে ভোট ঘিরে সহিংসতা ও কারচুপির অভিযোগ করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মানবাধিকার সংস্থা ও প্রতিপক্ষরা আগেই সতর্ক করেছিলেন যে কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতার আশ্বাস সত্ত্বেও নির্বাচনে কারচুপি হতে পারে। লন্ডনভিত্তিক সাংবাদিক সলিল ত্রিপাটির মতে সরকার এনফ্রেলের মতো বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ভিসা দিতে দেরি করার সমালোচনা করে বলেন যদি পর্যবেক্ষকদের অনুমতি না দেওয়া হয় তবে কিভাবে নির্বাচন স্বচ্ছ প্রমাণ হবে? কাতারভিত্তিক আল জাজিরার প্রতিবেদনে নির্বাচনে বড় আকারের অনিয়মের চিত্র প্রকাশ হয়েছে এবং এটাকে জনগণের রায় বলে গণ্য করা যায় না বলে অভিমত দেওয়া হয়। কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ ২৮৮ আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট জয়লাভ করলেও মহাজোটের সমর্থকদের বাধার মুখে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেনি বলে অভিযোগ করা হয়। অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে ভয়ে দূরে থাকা, তাদের মারধর করে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের ব্যালটে সিল মেরে ব্যালটবাক্স ভরাট করা, পুলিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে বাধা দেওয়া ও নৌকায় ভোট দিতে বাধ্য করার অভিযোগ তোলা হয়।[১২০]

এছাড়া ওয়াশিংটন পোস্টের মতে বিজয়ী ও বিজিত দলের মধ্যে পার্থক্যসূচক এমন চিত্র উত্তর কোরিয়ার মতো দেশে আশা করা যায়, বাংলাদেশে নয়। টাইম, দ্য ইকোনমিস্ট ও সিএনএন-এর বিশ্লেষণে এই নির্বাচনকে বিতর্কিত, আওয়ামী লীগের 'অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ উপায়ে' ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের 'প্রায় একদলীয় রাষ্ট্রে' পরিণত হওয়ার পর্যায়ে চলে যাওয়া, এবং নির্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের ওপর দমনপীড়ন চালানোর অভিযোগ করা হয়।[১২১] নিউইয়র্ক টাইমস-এর পরিচালকমণ্ডলী, সম্পাদক ও প্রকাশকের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকীয় পর্ষদের অভিমত অনুযায়ী নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের সদস্যদের নানাভাবে চাপে রাখা এবং প্রধানমন্ত্রীর দলের একচেটিয়া জয় আওয়ামী লীগ সরকারের অর্জনকে মলিন করেছে। পত্রিকাটি আশঙ্কা করেছে, বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসনের শিকার হতে পারে।[১২২] এছাড়া ভারতের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতে বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয় নি।[১২৩]

বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিযোগ তদন্তের দাবি ওঠে। বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ওঠা অনিয়মের অভিযোগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার আহবান জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ), নরওয়ে, এবং ইউএন হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (ইউএনএইচআরসি)। ইইউ এক বিবৃতিতে বলে, নির্বাচনের দিন সহিংসতার

---

[১১৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'খালেদা জিয়ার মুক্তি যৌক্তিক-ন্যায়সংগত দাবি: ড. কামাল', ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; আসিফ নজরুল, 'নির্বাচন নিয়ে গণশুনানিতে কী হয়েছে', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ মার্চ ২০১৯।

[১১৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'সন্তুষ্টির কথা জানাল ভারত, নেপাল, ওআইসি ও সার্ক', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮। ভারতের তিন সদস্যের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের অন্যতম সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা আরিজ আফতাবের মতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন সুশৃঙ্খল ও পরিশিলীতভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশ তাঁদের চোখে পড়েছে। সাত সদস্যের ওআইসি প্রতিনিধিদলের নেতা হামিদ এ ওপেলোইয়েরুর মতে নির্বাচনে প্রাণহানির ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নির্বাচনী কর্মকর্তারা সময়মতো ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করেছেন, ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দেওয়ার মতো দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক এসব মান পূরণ করার মানে হচ্ছে নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এ ছাড়া ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখার সময় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে দেখেছেন বলে জানান তিনি। এছাড়া নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে সন্তুষ্টির কথা জানান কানাডার নাগরিক তানিয়া ফস্টার। সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি হিসেবে তিনিসহ বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিক কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন।

[১২০] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১২১] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'চার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের নির্বাচন', ১ জানুয়ারি ২০১৯।

[১২২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশে 'প্রহসনের নির্বাচন', ১৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[১২৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশে নির্বাচন 'সুষ্ঠু ও অবাধ হয় নি', ১৭ জানুয়ারি ২০১৯। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন, অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন, এবং ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস। এসব প্রতিষ্ঠানের মতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচন বিতর্কমুক্ত নয়।

ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো বাধা থেকেই যায়, যা নির্বাচনী প্রচার ও ভোটকে কলঙ্কিত করেছে। এখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব অনিয়মের অভিযোগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা এবং পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজটি করা নিশ্চিত করতে হবে।[১২৪] এক বিবৃতিতে সদ্য শেষ হওয়া একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে 'নিরপেক্ষ' ও 'স্বাধীন' কমিশন গঠনের আহবান জানায় এইচআরডব্লিউ। এ আহবান জানায় নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনটি। এইচআরডব্লিউ ভোটের আগে ও ভোটের দিন বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর হামলা, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো, ভোট জালিয়াতি এবং নির্বাচন কর্মকর্তাদের একপেশে দলীয় আচরণের তদন্ত চায়।[১২৫] একটি বিবৃতিতে নরওয়ের কূটনৈতিক সূত্র থেকে নির্বাচনে অনিয়মের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়, এবং বলা হয় অনিয়মের উল্লেখযোগ্য মাত্রার অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা এসব ঘটনার সম্পূর্ণ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।[১২৬] ইউএনএইচআরসি-এর এক বিবৃতিতে বলা হয় বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী সহিংস আক্রমণ, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের দ্বারা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্মতিতে বা সক্রিয় অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়েছে।[১২৭] ২০১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, বাংলাদেশে নির্বাচন 'পারফেক্ট' (যথাযথ) হয়নি। তবে তিনি এও বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিয়ম বা অভিযোগের তদন্তের এখতিয়ার জাতিসংঘের নেই।[১২৮]

এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিইসি বলেন, 'সংসদ নির্বাচন জাতির জন্য বড় একটা কাজ। নির্বাচন যখন শেষ হলো তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন কমিউনিটি আমাদের এই নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেছে। তারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে। এই নির্বাচনকে তারা সফল হিসেবে উল্লেখ করেছে। নির্বাচন কেউ প্রত্যাখ্যান করেনি। সাইবেরিয়া থেকে শুরু করে ভলগা নদীর পাড় দিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে আমেরিকা, ইউরোপ - সর্বত্র নির্বাচনের বার্তা আমরা পৌঁছে দিয়েছি। সেখান থেকে শীতের হাওয়ায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমাদের কাছে এখানে চলে এসেছে।'[১২৯] পরে তিনি আরও বলেন "একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চিত্র রেকর্ডে রাখার মতো সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে হয়েছে। এটা আমি দাবি করতে পারি প্রকাশ্যে।"[১৩০]

অন্যদিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অত্যন্ত সুন্দরভাবে' সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল কমিশনে গিয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছে, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা অনেক বেড়েছে।[১৩১] টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিপুল বিজয়ের জন্য আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান। আর সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন শেষ করার জন্য জনগণ, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।[১৩২] বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিখুঁতভাবে কোন দেশে নির্বাচন হয়েছে প্রশ্ন করেন।[১৩৩]

৫.২ নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ আসনে নির্বাচনের পর কোনো সহিংসতা ঘটনা ঘটে নি। তবে তিনটি আসনে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার খবর পাওয়া যায়। কক্সবাজারের একটি আসনে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা ঐক্যফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের মারধর করে, ঘর ভেঙে দেয়, এবং যাতায়াতে বাধা দেয়। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। ঢাকার একটি আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদকের ওপর কতিপয় দুর্বৃত্ত হামলা করে। জামালপুরের একটি আসনে দু'একটি জায়গায় ছোট-খাট কিছু সহিংসতা হয়।

তবে নির্বাচনের পর সারা দেশে নির্বাচনী বিজয়ীদের সমর্থক ও কর্মী পরাজিত প্রার্থীদের ওপর হামলা চালানোর সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর ফলে বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মী আহত হন বলে অভিযোগ তোলা হয়, এবং বাড়ি ভাঙচুর, খামারে আগুন, লুটপাটের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনের দিন আহত সমর্থকদের দুইজনের মৃত্যু হয়।[১৩৪] তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটে

---

[১২৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আহ্বান ইইউর', ২ জানুয়ারি ২০১৯।

[১২৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চায় এইচআরডব্লিউ', ২ জানুয়ারি ২০১৯। এইচআরডব্লিউ-এর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'নির্বাচনের দিন জোর করে ব্যালটে সিল মারা, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানোর ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। ভোটকেন্দ্রেও ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য ছিল। তাই এসব ঘটনার তদন্তে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কমিশন গঠন করা উচিত।'

[১২৬] *ডেইলি স্টার*, 'পোলস অ্যানোমালিস: নরওয়ে কলস ফর প্রোব', ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

[১২৭] *ডেইলি স্টার*, 'পোলস ভায়োলেন্স: ইউএন রাইটস বডি ভয়েস কনসার্ন', ৫ জানুয়ারি ২০১৯।

[১২৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নিখুঁত নির্বাচন কোন দেশে হয়েছে, উল্টো প্রশ্ন কাদেরের', ২০ জানুয়ারি ২০১৯।

[১২৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'সাইবেরিয়া থেকে আমেরিকা, কেউ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেনি: সিইসি', ৩ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৩০] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'সংসদ নির্বাচন ছিল রেকর্ডে রাখার মতো: সিইসি', ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

[১৩১] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ভোট 'সুন্দরভাবে' করায় ইসিকে আ.লীগের কৃতজ্ঞতা', ৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৩২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'আ.লীগের জয় ও বিএনপির পরাজয়ের কারণ জানালেন প্রধানমন্ত্রী', ২৫ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৩৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নিখুঁত নির্বাচন কোন দেশে হয়েছে, উল্টো প্রশ্ন কাদেরের', ২০ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৩৪] *ডেইলি স্টার*, '১০ এএল মেন ইনজুরড ইন পোস্ট-পোলস ভায়োলেন্স', ১ জানুয়ারি ২০১৯।

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে, যেখানে এক নারী নির্বাচনে বিএনপির প্রতীক ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন বলে আওয়ামী লীগের ১০-১২ জন কর্মী-সমর্থক তাঁকে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে সংযমী আচরণ করার আহবান জানান।[১৩৫] তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটি তদন্ত করার পর সুবর্ণচরের ধর্ষণের ঘটনার সাথে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে।[১৩৬]

৫.৩ নির্বাচন পরবর্তী মামলা ও অভিযোগ দায়ের

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একমাস পরেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৯টি আসনে কোনো মামলা হয় নি বলে তথ্য পাওয়া যায়, এবং একটি এলাকায় তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে ২০১৯ সালের ১৩ জানুয়ারি সারা দেশ থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচন করা প্রার্থীদের মধ্যে ৭৪ জন নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে 'ভোট ডাকাতি' ও 'কারচুপির' অভিযোগ এনে তাঁরা এসব মামলা করেন।[১৩৭] এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা পর্যন্ত এসব মামলা চলমান ছিল।

৫.৪ নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল

আইন অনুসারে নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[১৩৮] এর ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ২০১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সব প্রার্থীর এজেন্টদেরকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার নির্দেশ দেয়, যা দিতে ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানায়।[১৩৯] তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব বিবরণীর কোনো সত্যায়িত অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে এসে পৌঁছায়নি বলে জানা যায়। প্রার্থীদের ব্যয়ের হিসাব চেয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে চিঠিও পাঠায়নি নির্বাচন কমিশন।[১৪০]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে কতজন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিয়েছেন সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় নি, তবে তাদের মধ্যে ২১টি আসনের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৫ জনের মধ্যে ৪০ জন প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিয়েছে।[১৪১] এই ৪০ জনের ব্যয়ের রিটার্ন পর্যালোচনা করে দেখা যায় কোনো প্রার্থীই তাদের রিটার্নে ২৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় দেখান নি, যদিও গবেষণার প্রাক্কলনে দেখা যায় প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭.৯% প্রার্থী। ব্যয়ের রিটার্ন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের গড় ব্যয় ১৫ লাখ ১৫ হাজার ৪৮৪ টাকা, যা ঐসব আসনে গড় সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার চেয়ে অনেক নিচে, যদিও এই গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী এই ৪০ জনের নির্বাচনী ব্যয় গড়ে ৭৯ লাখ ৭২ হাজার ৮৭৬ টাকা, যা ঐসব আসনে গড় সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার চেয়ে তিনগুণেরও বেশি। এই ৪০ জনের মধ্যে একজন সর্বনিম্ন ব্যয় দেখিয়েছেন ৭১ হাজার ৩০০ টাকা, এবং সর্বোচ্চ ব্যয় একজন দেখিয়েছেন ২৫ লাখ টাকা (সারণি ২০)। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রার্থীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃত নির্বাচনী ব্যয় গোপন করেছেন।

সারণি ২০: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের* রিটার্নে প্রদর্শিত নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)

	রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয়	তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়
গড় ব্যয়	১৫,১৫,৪৮৪	৭৯,৭২,৮৭৬
সর্বনিম্ন ব্যয়	৭১,৩০০	৬৫,০০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	২৫,০০,০০০	৪,৫৫,৬৯,৫০০

* ৪০ জনের রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয় এবং এই ৪০ জনের নির্বাচনী ব্যয়ের প্রাক্কলন।

[১৩৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা: সব পক্ষের দায়িত্বশীলতা প্রত্যাশিত', ২ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৩৬] *ডেইলি স্টার*, 'সুবর্ণচর রেপ 'নট লিংকড টু পোলস', ১৪ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৩৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'বিএনপি-গণফোরামের ৭৪ জন মামলা করেছে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে', ১৪ জানুয়ারি ২০১৯। এর আগে নির্বাচন শেষে ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের ঢাকায় বিএনপির গুলশান অফিসে ডেকে নির্বাচন নিয়ে তাঁদের বিস্তারিত অভিজ্ঞতা শোনা হয়। সেখানেই প্রার্থীরা নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকেও এ মামলার কথা জানানো হয়েছিল।

[১৩৮] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২, ধারা ৪৪গ।

[১৩৯] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৮১৭, তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১৪০] হারুন আল রশীদ, 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: প্রার্থীদের ব্যয়ের হিসাব পৌঁছায়নি ইসিতে!', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ মার্চ ২০১৯।

[১৪১] উল্লেখ্য, যেসব আসনের তথ্য পাওয়া যায় নি সেখানে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত (২ এপ্রিল ২০১৯) নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নের অনুলিপি চেয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

চিত্র ৪: প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয়ের সাথে প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনা

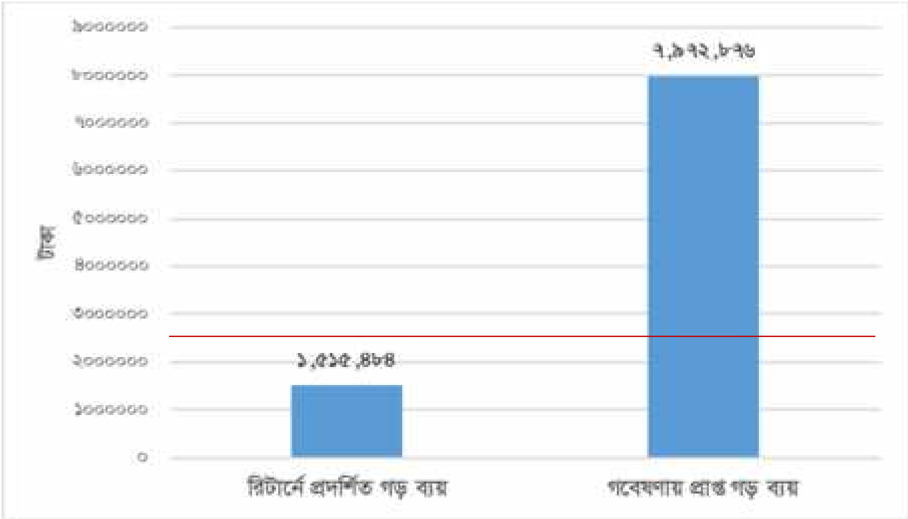

* লাল রেখাটি নির্বাচন কমিশন আসনপ্রতি নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয় নির্দেশ করছে।

৫.৫ উপসংহার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের বিশাল বিজয়ের পর নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়ম নিয়ে সব বিরোধী দল ও জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ-মাধ্যম, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অংশীদারের পক্ষ থেকে নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের দাবি উত্থাপন করা হয়। তবে এসব অভিযোগ নির্বাচন কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থীরা নির্ধারিত সীমার অনেক বেশি ব্যয় করলেও ব্যয়ের রিটার্নে তাঁরা সীমার মধ্যেই প্রচারণার ব্যয়ের হিসাব দেখিয়েছেন।

অধ্যায় ছয়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার প্রধান ও সাংবিধানিক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত হলেও এই প্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই একক ও বিচ্ছিন্নভাবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে নির্বাচন কমিশন ছাড়াও বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত রয়েছে সরকারের প্রশাসন, বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগ কাঠামো, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোট, নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা, সংবাদ-মাধ্যম ও সর্বোপরি সাধারণ জনগণ। এদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে সক্রিয় অবদান রাখে। তবে এসব প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের মধ্যে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে বলে জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্বাচনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পারে তারাই।

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কী ভূমিকা রেখেছে তা তুলে ধরা হলো।

৬.১ ক্ষমতাসীন সরকার

ক্ষমতাসীন দল/ জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। এসব কার্যক্রম অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভূমিকাই পালন করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল ও জোটকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছে বলে দেখা যায়।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য প্রণোদনা: সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠী সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চাকরিপ্রার্থী, তরুণ ও শিক্ষার্থীদের খুশি করতে কোটা বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ ও কোটা আন্দোলনে জড়িত শিক্ষার্থীদের জামিন দেওয়া, সড়ক পরিবহন আইন পাসের উদ্যোগ নেওয়া ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে জড়িত শিক্ষার্থীদের জামিন দেওয়া, পোশাকশ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা, শ্রম আইন সংশোধন, সারা দেশে প্রায় ৪০০ স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করা, হাজারখানেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া, কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি মাস্টার্সের সমমান দেওয়া, তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের উৎসে কর ও করপোরেট কর কমানো, ওষুধসহ নয়টি খাতে নগদ সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৪২]

একাদশ সংসদ নির্বাচনকে মাথায় রেখে সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ২০১৫ সালে বেতন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধির পর কখনো শূন্যপদ ছাড়াই পদোন্নতি, বিনা সুদে গাড়ি কেনার ব্যবস্থা, স্বল্প সুদে ফ্ল্যাট কেনা বা বাড়ি করার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করেছে সরকার। দশম জাতীয় সংসদের সর্বশেষ অধিবেশনে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেপ্তারের আগে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার বিধান রেখে 'সরকারি চাকরি আইন-২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাপ্তির দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ। সর্বশেষ নির্বাচন সামনে রেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ সরল সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া যাঁরা পেনশনের পুরো টাকা তুলে নিয়েছেন, অবসরের তারিখ থেকে ১৫ বছর পার হলে তাঁদেরও মাসিক ভিত্তিতে আবার পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমনকি প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্টও পাবেন তাঁরা। ২০১৮ সালের জুন মাসে সচিবদের জন্য ৭৫ হাজার টাকা করে মোবাইল ফোন কেনা এবং ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ হিসেবে মাসে ৩ হাজার ৮০০ টাকা করে বিল দেওয়ার প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। আগস্ট থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের জন্য মাসিক ঝুঁকি ভাতা এবং একই মাসে পুলিশ পরিদর্শকদের জন্য 'বিশেষ ভাতা' চালু করা হয়।[১৪৩]

নির্বাচনী প্রকল্প গ্রহণ: এছাড়া নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন সরকার বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। গত এক বছরে সাংসদদের জন্য চারটি প্রকল্প পাস করা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ২২ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সাংসদদের পছন্দমতো নিজ নির্বাচনী এলাকায় মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত বাবদ ৫ হাজার ৯১৫ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)।[১৪৪] দেখা যায়, ২০১৮ সালের জুলাই থেকে

[১৪২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ভোটের আগে সবাইকে খুশি রাখার চেষ্টা', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[১৪৩] ফখরুল ইসলাম ও মোশতাক আহমেদ, 'একের পর এক সুবিধা সরকারি চাকুরেদের', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ নভেম্বর ২০১৮।

[১৪৪] জাহাঙ্গীর শাহ, 'নির্বাচনী প্রকল্প: ভোট টানতে প্রকল্প পাসের 'উৎসব', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ অক্টোবর ২০১৮।

নভেম্বর পর্যন্ত ১২টি একনেক সভায় (একটি বিশেষ সভাসহ) ২ লাখ ৩০ হাজার ৭০৩ কোটি টাকার ১৯৫টি প্রকল্প পাস করা হয়। বিশেষ সভাটি নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার চারদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়।[১৪৫]

ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী প্রচারণা: নির্বাচনের প্রায় একবছর আগে থেকেই ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছে বলে লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব প্রচারণা সরকারি কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যদের অংশগ্রহণে সরকারি কার্যক্রমে দলীয় নির্বাচনী প্রচারণা অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ, এবং ২০১৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নীলসাগর ট্রেনে করে ঢাকা থেকে নীলফামারী পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের 'নির্বাচনী যাত্রা' উল্লেখযোগ্য।[১৪৬] এমনকি চিকিৎসকদের প্রতি তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আগামী নির্বাচনে চিকিৎসকেরা যেন নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে শেখ হাসিনার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেন, এবং প্রয়োজনে কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে যান তার আহবান জানান।[১৪৭]

ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ক্ষমতাসীন দলের প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান বা স্পট সম্প্রচারের সুবিধা নিয়েছে বলে লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের দশটি বিষয়ে অনুষ্ঠান ২৭টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে কেবল ডিসেম্বর মাসে মোট ১,৫৯,২৪১ সেকেন্ড সময় ধরে প্রচারিত হয় যার প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ১১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩০ টাকা, 'থ্যাংক ইউ পিএম' নামে একটি টিভি স্পট অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর এই তিনমাসে ১৩টি চ্যানেলে প্রচারিত হয়, যার প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৮ কোটি ৯৩ লাখ ৩৫ হাজার ৪৭০ টাকা, এবং 'আমরা বাংলাদেশের পক্ষে' নামে ৫৫টি টিভি স্পট ডিসেম্বর মাসে ২৫টি চ্যানেলে ১,৪৪,৭৯৫ সেকেন্ড প্রচারিত হয়, যার প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য ৫ কোটি ৯৭ লাখ ৮৩ হাজার ৬৪৫ টাকা। উল্লেখ্য উপরোল্লিখিত প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানগুলো সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদানে তৈরি করা হয়। এই বিজ্ঞাপনগুলোর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গ্রে (GREY) এবং প্রচার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল 'মাত্রা'। আওয়ামী লীগের মিডিয়া উপ-কমিটির সাথে বেসরকারি চ্যানেলের একটি অলিখিত মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে এই বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।[১৪৮]

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারিত সংবাদে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং বিরোধী দল/ জোটের অনুপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। ২০১৮ সালের ২ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিটিভিতে প্রচারিত দুপুর ২টা ও রাত ৮টার সংবাদে মোট ৩৫,৪৫৮ সেকেন্ড বা ৯ ঘন্টা ৫১ মিনিট সময় ধরে নির্বাচন ও প্রার্থীদের প্রচারণা সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করা হয়, যার অধিকাংশ সময় জুড়ে ছিল ক্ষমতাসীন দলের নেতা, মন্ত্রী ও এমপিদের নির্বাচনী খবর (মোট সময়ের ৯৪.০৭%)। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নির্বাচন সংক্রান্ত খবর ছিল ২ ঘন্টা ৬ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড (মোট সময়ের ২১.৪৫%), এবং যোগাযোগমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নির্বাচন সংক্রান্ত খবর ছিল ১ ঘন্টা ১৬ মিনিট ১৭ সেকেন্ড (মোট সময়ের ১২.৯%) সময় জুড়ে। এর বিপরীতে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ড. কামাল হোসেন ও ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত খবর ছিল ৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড, ড. কামালের সাথে সিইসি'র খারাপ ব্যবহারের সংবাদ ২১ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড, এবং ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত খবর ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড ধরে প্রচারিত হয়, যা মোট নির্বাচন সংক্রান্ত খবরের সময়ের ৫.০৩%। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিটিভির সংবাদ প্রচারের ফলে ক্ষমতাসীন দল একই সময় ধরে নির্বাচনী প্রচারণা করার সুযোগ পেয়েছে।[১৪৯]

---

[১৪৫] দি ডেইলি স্টার, 'টাকা ৮৬,৬৮৭ ক্রোর প্রজেক্টস গেট একনেক নড: সেকেন্ড বিগেস্ট অ্যালোকেশন অ্যাট সিঙ্গেল মিটিং কামস ওনলি ডে'জ বিফোর আনভেইলিং দ্য পোলস শিডিউল', ৫ নভেম্বর ২০১৮।

[১৪৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নৌকায় ভোট দিন', ২৭ অক্টোবর ২০১৮। ২৬ অক্টোবর বরগুনায় ২১টি প্রকল্পের উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী একটি জনসভায় নৌকায় ভোট দেওয়ার আহবান জানান। ২০১৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সিলেট সফর, ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল সফর এবং রাজশাহী সফরে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন, সমাবেশ করেন ও ভোট চান (তথ্যসূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার বন্ধে ইসিকে চিঠি বিএনপির', ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)। এছাড়া ২০১৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নীলসাগর ট্রেনে করে ঢাকা থেকে নীলফামারী পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের 'নির্বাচনী যাত্রা'র সময় ট্রেনটি বিভিন্ন স্টেশনে থামানো হয় ও নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়। এর ফলে বিপুল সংখ্যক যাত্রী সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন নি।

[১৪৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'শেখ হাসিনার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নামতে চিকিৎসকদের আহবান স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের', ২৭ মে ২০১৮।

[১৪৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ডিসেম্বর ২০১৮ এবং এপ্রিল ২০১৯।

[১৪৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দৈনিক প্রথম আলো ২২ থেকে ২৬ ডিসেম্বর বিটিভি ও বেতারের সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখায় নির্বাচনকেন্দ্রিক সংবাদে সরকারি দল ও তাদের শরিকদেরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। সরাসরি নির্বাচনী প্রচারণার সংবাদে ৯০ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে সরকারি দলের প্রার্থীদের জন্য। ঐক্যফ্রন্ট বা বিএনপিসহ অন্যরা যে সামান্য সময় পেয়েছে, তার মধ্যেও সরকারি দলের বিপক্ষে যায়, এমন প্রসঙ্গ ছিল না। আর নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অন্য খবর ও অনুষ্ঠানগুলো এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে, যাতে তা শাসক দলের পক্ষে যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, 'বিটিভি-বেতারে পুরোটাই 'সরকার'', ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮। আবার নির্বাচনের আগের একমাস ও পরের একমাস বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের খবর বিশ্লেষণ করে প্রথম আলো দেখায় আওয়ামী লীগ আর জোটসঙ্গীদের জন্য বরাদ্দ সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে বিটিভির হিসাব হচ্ছে ৩৬১ মিনিট বনাম ১ মিনিট, আর বেতারে হিসাব হচ্ছে ২৪৯ মিনিট বনাম ৪ মিনিট। প্রথম আলো গত ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৪ জানুয়ারি সময়কালে মাধ্যম দুটির নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট খবর ও কিছু অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে। বিটিভিতে রাত আটটার খবরের ২৭ দিনের এবং বেতারে রাত সাড়ে আটটার খবরের ২৯ দিনের সময় মাপা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মোজাহিদুল ইসলাম, 'টাকা মানুষের, খবর সরকারের', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ মার্চ ২০১৯।

এছাড়া সিআরআই ও অ্যাপলবক্স ফিল্মস-এর প্রযোজনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র 'হাসিনা: এ ডটার'স টেল' চারটি সিনেমা হলে ২০১৮ সালের ১৬ নভেম্বর মুক্তি দেওয়া হয়, এবং রাজধানীর স্টার সিনেপ্লেক্স, ব্লকবাস্টার সিনেমাস, মধুমিতা ছাড়াও চট্টগ্রামের সিলভার স্ক্রিনে দেখানো হয়। একাদশ জাতীয় নির্বাচনের অনুমোদিত সময়ের প্রচারণাকালে বাংলাদেশের বেসরকারি চ্যানেলের একটিতে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ এবং আরেকটিতে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮ এটি প্রচার করা হয়। আগামী নির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসেবে এবং একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ইতিহাসের নানা ঘটনা, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ক্ষমতার পালাবদল, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এককেন্দ্রিক উপস্থাপন করা, যা আচরণবিধির লঙ্ঘন বলে বিএনপি'র পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়।[১৫০] ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থাকার কারণে নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে যে সুযোগ পেয়েছে, এক্ষেত্রে বিএনপিসহ অন্য কোনো প্রতিপক্ষকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

প্রশাসন ও পুলিশের দলীয়করণ: সংবিধান অনুযায়ী কোনো সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হলে সংসদ আপনা-আপনি ভেঙে যাবে, কিন্তু ভেঙে যাওয়া তারিখের পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করা যাবে।[১৫১] এ হিসাবে দশম সংসদের প্রথম বৈঠক ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি ধরে সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০১৯ সালের ২৮ জানুয়ারি। তবে ক্ষমতাসীন দল অন্যান্য দলের দাবি অগ্রাহ্য করে সংসদ না ভেঙে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে সরকারে থাকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা ক্ষমতাসীন দল ও জোটের জন্য সহজ হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়।

ক্ষমতাসীন দলে থাকার সুবিধা ব্যবহার করে প্রশাসন ও পুলিশের দলীয়করণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ২০১৮ সালের ৯ নভেম্বর ৬৪ জেলার ডিসি ও দুইজন ডিভিশনাল কমিশনারকে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সাথে সাথে ৩১ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর সময়ে ৩৬টি জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া, এবং তফসিল ঘোষণার আগের দিন ২৩৫ জন এএসপি'কে পদোন্নতি দিয়ে এসপি করা হয়।[১৫২] তফসিল ঘোষণার পরে পুলিশ এবং প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরণ, সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের সহিংসতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ বিভিন্ন হয়রানি এ অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণ করে।[১৫৩] পরে নির্বাচন কমিশন আয়োজিত আইনশৃঙ্খলা সমন্বয় সভায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র থেকে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ, ভোটের আগে ইন্টারনেটের গতি কমানো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল ব্যাংকিং বন্ধ রাখাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব করেছেন প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা। তাঁদের মতে অপপ্রচার ঠেকানো ও নির্বাচন সুষ্ঠু করার স্বার্থে এসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।[১৫৪] এমনকি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও পোলিং কর্মকর্তাদের সম্পর্কে পুলিশ বিশেষ করে তাঁদের বর্তমান ও অতীত রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে বলে জোরালো অভিযোগ ওঠে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন।[১৫৫] এরপর নির্বাচনের আগের রাতে ও নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যালটবাক্স ভর্তি করার পেছনে কৃতিত্ব পুলিশ ও প্রশাসনের।

বক্স ৪: সমতল মাঠ না থাকার নিয়ে একজন সাংবাদিকের বক্তব্য

"দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সম্ভব না কারণ যাদের ন্যায় করার কথা ছিলো তারা যদি অন্যায় করে তাহলে কী করে দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে? একটি দল স্বাধীনভাবে প্রচারণা করতে পারছে না, বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে, নেতা-কর্মীকে প্রশাসন এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এরপর তাকে পেন্ডিং মামলায় গ্রেপ্তার করছে আর এর কোন প্রতিবাদ নেই। আমরা সাংবাদিকরা এর ওপর লেখালেখি করলে আমরাও গুম হয়ে যাবো, আমাদের জান নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। এর জন্য কোনো সাংবাদিক এসবের বিরুদ্ধে লেখে না। যে দেশে সাংবাদিকদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে সত্য ঘটনা লিখতে বাধা দেওয়া হয়, সে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থান কোন পর্যায় এবং তারা কীভাবে এই ক্ষমতার অপব্যবহারকারিদের সামনে সুযোগ দেবেন এটা অনেক বড় চিন্তার বিষয়। তবে যে ভাষায় বলি না কেনো কোনো ভাবেই এটাকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলা যাবে না, এটা হবে এক পক্ষ নির্বাচন।"

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি আসনের একজন স্থানীয় সাংবাদিক

বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে গেছে। এমনকি সংলাপে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়ার পরও নির্বাচনের সময় পর্যন্ত ধরপাকড় ও গ্রেফতার করা হয়েছে।[১৫৬] এছাড়া সরকারবিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়া, প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা,

---

[১৫০] *দৈনিক প্রথম আলো*, "হাসিনা: এ ডটার'স টেল' কি প্রচারণামূলক নয়: রিজভী', ১৭ নভেম্বর ২০১৮।
[১৫১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১২৩(৩) (ক)।
[১৫২] আলী রিয়াজ, 'নির্বাচন কমিশনের আচরণে পক্ষপাত', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ নভেম্বর ২০১৮।
[১৫৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ঐক্যফ্রন্টের অভিযোগ: আট দিনে গ্রেপ্তার ২২৪১ নেতা-কর্মী', ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১৫৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ চায় প্রশাসন', ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১৫৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'পুলিশের ফোনে বিব্রত নির্বাচন কর্মকর্তারা', ১৭ নভেম্বর ২০১৮।
[১৫৬] আসাদুজ্জামান ও আহমেদ জায়িফ, 'সংলাপের পর ১০০ মামলা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর ২০১৮।

সহিংসতার কারণে বিরোধী দল প্রচারণায় অনেকখানি অপারগ ছিল। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ করা হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় নি। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে পুলিশ, প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ ছিল বলে দাবি করলেও বিরোধিদলীয় জোট/দলের প্রার্থী, ভোটার, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিকদের একাংশের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা ভিন্নমত প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় এবং ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এটি এক বিবৃতিতে বিরোধী রাজনীতিবিদদের নিশানা বানানো ছাড়াও সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতা, স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সমাবেশের অধিকারে বাধার সৃষ্টি, ইন্টারনেটের ওপর নজরদারি ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন, নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একপেশে ভূমিকার অভিযোগ তোলে। এইচআরডব্লিউ-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের শুরু পর্যন্ত সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিক্ষোভকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যমূলক আটক ও গ্রেপ্তার এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুবসংগঠনের হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটছে। এই দমনাভিযান এবং নতুন পাস করা বিস্তৃত পরিসরের ও অস্পষ্ট শব্দগুচ্ছের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসই) আতঙ্কের পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।[১৫৭]

৬.২ নির্বাচন কমিশন

একাদশ সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন কৃতিত্বের দাবিদার। প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য নির্বাচনী আচরণ বিধি সংশোধন, মনোনয়নপত্র বাতিলের পর শুনানিতে প্রার্থিতা ফেরত, ভোটার তালিকা ছাপানো, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ, দল ও প্রার্থীর জন্য প্রতীক বরাদ্দ ইত্যাদি কাজ সময়মত সম্পাদন করে।

মনোনয়ন বাতিল নিয়ে বিতর্ক: তবে এই নির্বাচন আয়োজন করতে গিয়ে অনেক ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সারাদেশে ৩০০ আসনের বিপরীতে তিন হাজার ৬৫টি মনোনয়নপত্রের মধ্যে ৭৮৬টি ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্তি, তথ্য গোপন করা, হলফনামা ঠিকভাবে পূরণ না করা, ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণে বাতিল করা হয়। এই বাতিল প্রক্রিয়া নিয়েও বিভিন্ন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছোটখাটো কারণে মনোনয়ন বাতিল না করার জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিলেও অনেক ছোটখাটো কারণে অনেকের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়।[১৫৮]

সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যর্থতা: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় নির্বাচন কমিশন অনেকক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয় নি। দেখা যায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় কোনো উদ্যোগ নেয় নি। সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কোনো ভূমিকা ছিল না। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দমনে সরকারের ভূমিকার প্রেক্ষিতে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নীরবতা পালন করেছে বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার করেছে। সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারে নি, এবং একইসাথে সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে পারে নি নির্বাচন কমিশন। একদিকে সরকারি দলের প্রার্থীর সক্রিয়, সরব, শক্তিশালী উপস্থিতি ও অন্যদিকে বিরোধী দলের প্রার্থীদের প্রচারণায় ভীতি প্রদর্শন, বিভিন্নভাবে বাধা, হামলা, সহিংসতা বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। নির্বাচনী প্রচারণাকালীন নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদেরকে বিভিন্ন হয়রানির অভিযোগ উত্থাপিত হলেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সক্রিয় ভূমিকার ঘাটতি দেখা গেছে।

নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষকরে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উদাহরণও তৈরি করতে পারে নি। ঢাকা মহানগরীর ১৫টি আসনের ১৩২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৩ জন বিরোধী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি মতবিনিময় সভায় অভিযোগ করেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো পর্যায়েই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সমান সুযোগ) নেই। প্রচারে নামলেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা হামলা, মারধর ও হয়রানি করছেন বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন, প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।[১৫৯] সরকারি দল ও অন্যান্য দলের অনেক প্রার্থীর বিভিন্ন নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিইসি 'বিব্রত বোধ' করেছেন, আবার কোনো

[১৫৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'এইচআরডব্লিউর বিবৃতিতে অভিযোগ: ভোটের আগে বিরোধীদের ধরপাকড়, ভয়ভীতি', ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮।
[১৫৮] সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, http://www.bbc24news.com/58664 (৪ ডিসেম্বর ২০১৮)।
[১৫৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ক্ষমতাসীনেরা বিধি ভঙ্গ করলেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ইসি', ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮।

কোনো ক্ষেত্রে 'চোখে পড়েনি' বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।[১৬০] এর ফলে নির্বাচন কমিশন যেমন সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারে নি, আবার অন্যদিকে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' আছে কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ পেয়েছে।[১৬১] আবার একজন নির্বাচন কমিশনার 'শতভাগ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা সম্ভব নয়' বলেও সমালোচিত হন।[১৬২] নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং অনুকূল পরিবেশ নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এবং মতবিরোধ জনমনে নির্বাচন নিয়ে আস্থাহীনতা তৈরী করেছে।

বিরোধী রাজনৈতিক জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে নির্বাচন কমিশন সচিব, জনপ্রশাসন ও পুলিশের ৯২ জন কর্মকর্তার অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করলেও কাউকে বদলি করা হবে না বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই তালিকায় ১৭ ডিসিসহ জনপ্রশাসনের ২২ কর্মকর্তা, এবং ৩১ এসপিসহ পুলিশের ৭০ কর্মকর্তা ছিলেন।[১৬৩]

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি: ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কমিশনের সচিব ইভিএম বড় পরিধিতে ব্যবহার করার বিষয়ে কমিশনের পরিকল্পনার ঘোষণা দিলে এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার তার দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করে বলেন যে এর ফলে পুরো নির্বাচন বিতর্কিত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীও ইভিএম ব্যবহার দ্রুত আরোপ না করার জন্য তার মতামত দেন। সরকারি দল ছাড়া অন্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করে বলা হয় ইভিএম ব্যবহার ভোট কারচুপিকে সহায়তা করবে। অন্যদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার মন্তব্যে বলেন, এই নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য অংশীজনদের এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করবে। আরও বলেন, সরকার যদি আইন করে এবং অনুকূল পরিবেশ থাকে তাহলে কমিশন অল্প কিছু আসনে এর ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করবে।[১৬৪] পরবর্তীতে ছয়টি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হলেও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রথম থেকে বিভিন্ন সময়ে কমিশনের বিভিন্ন অবস্থান কমিশনের ভূমিকা জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা: নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যসমূহ কমিশনের আন্তঃসমন্বয়হীনতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। প্রধান কমিশনার ২০১৮ সালের ০৭ আগস্ট এবং ২৭ সেপ্টেম্বর তার বক্তব্যে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের তফসিল অক্টোবরে ঘোষণা দেওয়ার কথা বলেন। আবার অক্টোবর মাসেই তিনি বলেন, ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা তিনি বলেন নি এবং জানুয়ারির আগে নির্বাচনের সম্ভাবনা কম। এভাবে নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রেও কমিশনের অবস্থান ছিল বিতর্কিত। তফসিল ঘোষণার পর দলীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করার জন্য কোনো প্রার্থী তার সমর্থকদের নিয়ে মিছিল/শোডাউন করতে পারবে না এমন কোনো নির্দেশনা আচরণবিধি বা কমিশনের পক্ষ থেকে উল্লেখ ছিল না। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মিছিল নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগহের ক্ষেত্রে কোনোরকম নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও বিএনপি'র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে পুলিশের আইজি-কে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি দিয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়, ফলে বিএনপি কর্মী-সমর্থকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। এই বিষয় নিয়ে কমিশনের অন্যান্য কমিশনারদের বক্তব্য - "মনোনয়ন প্রত্যাশী ও তার সমর্থকরা ফরম কিনতে দলবেধে আসবে এটা স্বাভাবিক। এটা নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন নয়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় মিছিল/শোডাউন করা নিষিদ্ধ, কেনার সময় নয়।[১৬৫] কমিশনের এ ধরনের দ্বৈত আচরণ রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বে বিতর্ক সৃষ্টি করে।

তথ্য প্রবাহের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ: নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞার কারণে কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোর। নির্বাচনী প্রচারণার অনুমোদিত সময়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী, সরকারবিরোধী উস্কানিমূলক বিষয় প্রচার করার কারণ দেখিয়ে বিএনপি'র ওয়েবসাইট ব্লক করাসহ নয়টি ফেসবুক পেইজ এবং ছয়টি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। বিএনপি'র পক্ষ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হলেও কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি।[১৬৬] নির্বাচনের সময়ে ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা হয়, এবং মোবাইল ফোনের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা হয়।[১৬৭]

[১৬০] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ইসির বিব্রত বোধ করা যথেষ্ট নয়: ড. কামাল', ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১৬১] ২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বলেন, 'আমি মনে করি না নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলে কিছু আছে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কথাটা এখন অর্থহীন কথায় পর্যবসিত হয়েছে।' (প্রথম আলো ডটকম, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮)। এর পরদিনই এ কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলেন, 'মাহবুব তালুকদার সত্য বলেননি। নির্বাচনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ভালো রয়েছে।' (প্রথম আলো ডটকম, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮)।

[১৬২] *দি ডেইলি স্টার*, '১০০ পার্সেন্ট লেভেল-প্লেয়িং ফিল্ড নট পসিবল: হাউ মাচ ক্যান দ্যা ইসি প্রভাইড?', ২২ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১৬৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ইসি পুলিশ ও প্রশাসনে রদবদল করবে না', ২৩ নভেম্বর ২০১৮।

[১৬৪] *দি ডেইলি স্টার*, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

[১৬৫] *দি ডেইলি স্টার*, ১৬ নভেম্বর, ২০১৮।

[১৬৬] *দি ডেইলি স্টার*, ২১ ডিসেম্বর, ২০১৮।

[১৬৭] *দি ডেইলি স্টার*, 'মোবাইল ইন্টারনেট স্পিড স্ল্যাশড ইনডেফিনিটলি', ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৮।

এছাড়া জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[১৬৮] নির্বাচনের আগের রাত থেকে ২৪ ঘণ্টা সব ধরনের যান্ত্রিক যানবাহন (বেবিট্যাক্সি, অটোরিকশা, ইজিবাইক, ট্যাক্সিক্যাব, মাইক্রোবাস, জিপ, পিকআপ, কার, বাস, ট্রাক, টেম্পো প্রভৃতি) নির্বাচনী এলাকায় বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বিষয়টি কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়ে সমালোচনা হয়।[১৬৯] পরবর্তীতে সাংবাদিকদের নির্বাচনের সময় মোটরসাইকেল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলেও নির্বাচনের সময়ে এ ধরনের তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।[১৭০]

নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর ৪ নভেম্বর ২০১৮ সরকার একনেক-এ প্রায় ১২৫ কোটি টাকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ নামে প্রকল্প অনুমোদন করে। নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ সদর দপ্তরের অধীনে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান এই প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই প্রকল্পের আওতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইনে ক্ষতিকর, আপত্তিকর, বেআইনি পোস্ট ফিল্টার ও ব্লক করার কাজ এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।[১৭১]

নির্বাচন পর্যবেক্ষদের ওপরও নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। একটি সভায় নির্বাচন কমিশনের সচিব নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের 'মূর্তির মতো' পর্যবেক্ষণ করতে হবে বলে সমালোচিত হন। দেশীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন বহনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ওপর সে নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। একাধিক নির্দেশনায় দেশীয় পর্যবেক্ষকদের কাজের ক্ষেত্র সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তাঁদের যাওয়ার সুযোগ নেই। আবার তাঁরা একই ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের পুরোটা সময় থাকতে পারবেন না। ভোটকেন্দ্রেও তাঁরা দর্শকের ভূমিকার বাইরে কিছু করতে পারবেন না। কোনো অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলার ছবিও তুলতে পারবেন না। স্পষ্টতই এসব পর্যবেক্ষকের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ ও অধিকারকে মারাত্মকভাবে সংকুচিত করবে বলে সমালোচনা করা হয়।[১৭২]

প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা নিয়ন্ত্রণ করায় ব্যর্থতা: নির্বাচনী আইনে প্রচারণার জন্য প্রার্থীপ্রতি একেকটি আসনের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও এই আইন প্রয়োগে নির্বাচন কমিশন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি। প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ব্যয় পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশনের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে প্রতিটি সংসদীয় আসনে ব্যয়সীমা নিয়ন্ত্রণের জন্য সাবেক নির্বাচন কমিশনার ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে গঠিত মনিটরিং কমিটির মত জাতীয় নির্বাচনেও একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেখানে কমিটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আসনের প্রার্থীদের ব্যয়ের বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং তার মাধ্যমে কালো টাকার ব্যবহার এবং অবৈধ অর্থের উৎস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তবে এই প্রস্তাব ২০১৪ সালের নির্বাচনে সরকারকে দেওয়া হলেও তা গৃহীত হয় নি।[১৭৩]

প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত না করা: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ধারা ৪৪ঘ (৩) অনুযায়ী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব ছিল নির্বাচন কমিশনের। এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার সময় পর্যন্ত এসব তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় নি।

নীতিমালা ও আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, লাইট হাউস, খান ফাউন্ডেশন ও ডেমক্রেসিওয়াচ এবং বিএনপি জানিপপকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দেওয়ার আবেদন করে। এ ছাড়া জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, নবলোক, কোস্ট ট্রাস্ট, শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ও নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (এনআরডিএস) বিষয়েও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তোলে আওয়ামী লীগ। তবে পর্যবেক্ষক সংস্থার অনুমোদনে একই মানদণ্ড অনুসরণ না করার অভিযোগ ছিল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে।[১৭৪] বিরোধিদলীয় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বেশ কয়েকটি দেশি ও বিদেশী পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অনুমোদন দেওয়া না হলেও কয়েকটি পর্যবেক্ষক সংস্থা ক্ষমতাসীন দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন পায়। উদাহরণ

---

[১৬৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'সাংবাদিকদের জন্য ইসির নীতিমালা', ২২ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১৬৯] শওকত হোসেন, 'অনিয়মের সাক্ষ্য রাখতে চায় না নির্বাচন কমিশন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮; *দৈনিক প্রথম আলো*, 'যান চলাচলে ইসির নিষেধাজ্ঞা: এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন', ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের সবচেয়ে অবাস্তব ও অযৌক্তিক দিক হলো ২৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টা থেকে শুরু হয়ে ১ জানুয়ারি মধ্যরাত - এই চার দিন মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি। অন্যান্য যানবাহন সাংবাদিকেরা নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে পারলেও এক্ষেত্রে সেই সুযোগ ছিল না। এর অর্থ হলো, যেসব সাংবাদিক ভোটকেন্দ্রের খবর সংগ্রহ করবেন পরোক্ষভাবে তাঁদের কাজে বাধা সৃষ্টি হবে। কেননা প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা অলিগলিতে বড় যানবাহন ঢুকতে পারে না বলেই সাংবাদিকেরা খবর সংগ্রহের কাজে মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন।

[১৭০] *দি ডেইলি স্টার*, 'জুরনোস ক্যান ইউজ মোটরবাইকস অন ইলেকশন ডে: ইসি', ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৮।

[১৭১] *বাংলা ট্রিবিউন*, ৭ নভেম্বর ২০১৮।

[১৭২] কামাল আহমেদ, 'অক্ষমতা ঢাকতেই কি মূর্তির প্রয়োজন?', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ নভেম্বর ২০১৮।

[১৭৩] *দি ডেইলি স্টার*, 'হাউ উইল ইসি চেক ইলিগ্যাল স্পেনডিং? নো এফেক্টিভ মেকানিজম ইন প্লেস টু কার্ব ইলেকশন এক্সপেনডিচার বিয়ন্ড সিলিং', ১০ নভেম্বর, ২০১৮।

[১৭৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচন নিয়ে শেষ পর্যন্ত আশাবাদী থাকতে চাই : শারমিন মুরশিদ', ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮।

হিসেবে বলা যায়, পর্যবেক্ষণের অনুমোদন পাওয়া একটি সংস্থার মহাসচিব, আরেকটির নির্বাহী পরিচালক একই ব্যক্তি। একটি সংস্থার অফিস ও ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। একটি সংস্থার চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য, নীতিমালা অনুযায়ী যা থাকার কথা নয়। এছাড়া এই সংস্থার টাকা আসে নগদে ও বিকাশে, এবং এর নামের আগে 'সার্ক' থাকলেও, 'সার্ক'-এর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।[১৭৫]

৬.৩ রাজনৈতিক দল ও জোট

প্রার্থী মনোনয়নে অনিয়ম: দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক আসনে একই দলের একাধিক প্রার্থী ছিলেন। প্রার্থিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি থেকে মনোনীত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার প্রক্রিয়া কোনো দলের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালে এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও ২০১৮-এর নির্বাচনে কয়েকটি দলীয় পর্যায়ে করা জরিপের ওপর এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তি করে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়। এছাড়া অনেক আসনে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের সমর্থন সংসদ সদস্যের বিপক্ষে থাকায় দলীয় কোন্দলের বিষয়টিও দৃশ্যমান হয়।[১৭৬] আর মনোনয়নে তৃণমূলের অংশগ্রহণ না রাখার সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে মনোনয়ন-বাণিজ্যের অভিযোগ উত্থাপিত হয়।[১৭৭]

দলীয়ভাবে নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন: দলীয়ভাবে কোনো কোনো নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করা হয়, এবং প্রধান দুই জোটের বিরুদ্ধেই নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তোলে অন্যান্য দল। প্রধান দুইটি জোটই রাস্তা অবরোধ করে জন-সমাবেশ করে। প্রধান দুইটি জোটের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয় সিলেট থেকে যা প্রচারণায় ধর্মের অপব্যবহার বলে চিহ্নিত করা যায়।[১৭৮]

৬.৪ প্রার্থী

নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘন: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সাথে সাথে প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা, এবং এর ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা দৃশ্যমান হয়েছে। প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন।

- ***হলফনামায় তথ্য না দেওয়া*** — মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে আট তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক প্রার্থী সব তথ্য দেন নি।
- ***নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয়*** — গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের বেশিরভাগই নির্বাচনী ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন, যদিও নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে নির্ধারিত ব্যয়সীমার মধ্যেই ব্যয় দেখিয়েছেন।
- ***প্রচারণায় আচরণ বিধি লঙ্ঘন*** — গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো আসনেই প্রার্থীদের কোনো না কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন। অনুমোদিত সময়ে প্রচারণার ক্ষেত্রে যেসব আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে সেগুলোর মধ্যে যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসভা বা শোভাযাত্রা, দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো, নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারকে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান, পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা, প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক ক্যাম্প/অফিস স্থাপন, ভোটের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা, পোস্টারে মুদ্রণ সংখ্যা, প্রেস/প্রিন্টার্সের নাম, ফোন নম্বর না দেওয়া, নির্ধারিত সময়ের বাইরে প্রচারণা চালানো, মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আরও লক্ষ করা যায় যে ক্ষমতাসীন জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর প্রার্থীদের মধ্যে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা অনেক বেশি, যেখানে অন্যান্য সরকার-বিরোধী দল, যেমন বিএনপি বা গণফোরামের প্রার্থীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম ছিল।
- ***নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করা*** — নির্বাচনের পরে এক মাসের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেক প্রার্থী এই হিসাব সময়মত দাখিল করেন নি।

৬.৫ নাগরিক সমাজ

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও মতামত প্রদান অব্যাহত ছিল।[১৭৯] এসব আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকার, ক্ষমতাসীন দল ও জোট এবং বিরোধী দল ও জোটের কার্যক্রম ও করণীয়, নির্বাচনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের অনিয়ম ও আইনের ব্যত্যয়, নির্বাচনকালীন সরকারের

---

[১৭৫] আরাফাত সেতু, 'দু'টি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা সমাচার', *দি ডেইলি স্টার বাংলা*, ৭ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৭৬] *দি ডেইলি স্টার*, 'থর্নি ইস্যুস রিমেইন থর্নি', ১৮ অক্টোবর ২০১৮।

[১৭৭] *সম্পাদক.কম*, 'হাজার কোটি টাকার মনোনয়ন বাণিজ্য: তারেক চ্যাম্পিয়ন, এরশাদ দ্বিতীয়', ২১ নভেম্বর ২০১৮।

[১৭৮] *দি ডেইলি স্টার*, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল অভিযোগ করে যে বড় দলগুলো আচরণ বিধি ভঙ্গ করছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে যে চারদলীয় জোট আচরণ বিধি ভঙ্গ করছে এবং নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে আচরণ বিধি ভঙ্গের সুযোগ করে দিচ্ছে।

[১৭৯] দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ইসি ইচ্ছে করেই 'ঘুমিয়ে আছে'', ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

কাঠামো, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও করণীয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত বক্তব্য পাওয়া যায়, এবং খুব কম সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়।[১৮০]

৬.৬ নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই পূর্বের নির্বাচনগুলোর তুলনায় সবচেয়ে কম সংখ্যক আন্তর্জাতিক ও দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা নির্বাচনের দিন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলগুলোর পক্ষ থেকে নির্বাচনের দিনই সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্বাচন হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়, এবং সহিংসতার ঘটনাগুলোকে দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ তাদের বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে।[১৮১] দেশী পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন ও ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অতীতের চেয়ে অনেকাংশে ভালো, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মন্তব্য করে।[১৮২] তবে কোনো পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় নি।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে অনুমোদনপ্রাপ্ত স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়নি। এ আসনগুলোর মধ্যে ২৩টি আসনে নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের নাম জানা যায়, এর মধ্যে ১০টি আসনে পর্যবেক্ষকরা মৌখিকভাবে তাদের পর্যবেক্ষণের সারাংশ বলেছেন। বাকিরা কেউ প্রতিবেদন দিতে বা তাদের পর্যবেক্ষণ বলতে রাজি হন নি। কোনো কোনো সংস্থায় যোগাযোগ করার মতো কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো ফোন নম্বর পাওয়া যায়নি। কয়েকটি আসনে পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের মৌখিক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, ভোটে কারচুপি, অনিয়ম, সহিংসতা, পক্ষপাতিত্ব তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তবে লিখিত প্রতিবেদনে এসব উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ছাড়া এই প্রতিবেদন অন্য কোথাও প্রকাশ না করার নির্দেশনাও ছিল, ফলে কোনো পর্যবেক্ষণ সংস্থা থেকেই কোনো লিখিত প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি। তবে নির্বাচনে অনিয়মের বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ প্রকাশিত হতে থাকলে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ নির্বাচন ততটা সুষ্ঠু হয়নি বলে মতামত প্রকাশ করেন।[১৮৩]

৬.৭ সংবাদ-মাধ্যম

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়ায় সংবাদ-মাধ্যম বিশেষকরে প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে দলীয় ও প্রার্থীর প্রচারণা সংক্রান্ত গতানুগতিক সংবাদ প্রচারের ধারার বাইরে গিয়ে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা হয়। এসব তথ্যের মধ্যে ছিল প্রার্থীদের আয়-ব্যয়, সম্পদের হিসাব, ফৌজদারি মামলার ধরন ও বর্ণনা, ঋণ, কর ও বিল খেলাপ সংক্রান্ত তথ্য, যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ এবং এর ওপর বিশ্লেষণ, মন্তব্য প্রতিবেদন, বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, এবং আসনগুলোর ওপর মৌলিক তথ্য প্রকাশ করা হয় যা সংগ্রহে রাখার মতো। বিভিন্ন আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি পর্যবেক্ষণ করে সচিত্র তথ্য প্রকাশ করা হয়। এর সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন, ক্ষমতাসীন সরকার, বিরোধীদলীয় জোট ও দলের বিভিন্ন বিতর্কিত কার্যক্রম ও ভূমিকা নিয়ে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়, এবং সম্পাদকীয় ও মন্তব্য কলামে প্রতিবেদন ও কলাম প্রকাশিত হয়। প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলোতে নির্বাচনের দিনের অনিয়ম বিভিন্ন আসন ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা হয় এবং বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়।[১৮৪]

---

[১৮০] দেখুন মিজানুর রহমান, '৬ মাস নির্বাচনী পাহারাদার হোন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০১৯; মনজুর আহমেদ, 'এ কেস অব ওভারকিল: ক্যান ইট স্টিল বি রিডিমড?', *দি ডেইলি স্টার*, ২ জানুয়ারি ২০১৯; আনু মুহাম্মদ, 'জাতীয় নির্বাচন: জেতার জন্য এত কিছুর দরকার ছিল কি?', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ জানুয়ারি ২০১৯; এম সাখাওয়াত হোসেন, 'ইসিকে অনেক প্রশ্নে উত্তর খুঁজতে হবে', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ জানুয়ারি ২০১৯; কামাল আহমেদ, 'একটি সফল নির্বাচন ও কিছু প্রশ্ন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০১৯।

[১৮১] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'সন্তুষ্টির কথা জানাল ভারত, নেপাল, ওআইসি ও সার্ক', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[১৮২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮। সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে রাজধানীর ২৪টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম দেশের ২১৪টি আসনের ১৭ হাজার ১৬৫টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছে বলে জানায়।

[১৮৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'নির্বাচন সুষ্ঠু বলে মত দেওয়ার পর এখন ভিন্ন সুর', ২২ জানুয়ারি ২০১৯। এর মধ্যে রয়েছেন কানাডার তানিয়া ফস্টার, সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুস সালাম। তানিয়া ফস্টার জানান আওয়ামী লীগের সঙ্গে যে সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের যোগসূত্র রয়েছে বা সংগঠনটি যে সার্কের কেউ নয়, তা তিনি জানতেন না। অন্যদিকে বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুস সালামের মতে ভোটার ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন আওয়ামী লীগের কর্মীরা ভোটের আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভরেছেন, ভোটারদের ভয়ভীতি দেখিয়েছেন। তাঁর মতে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি, এবং নতুন ভোট হওয়া উচিত।

[১৮৪] উদাহরণ হিসেবে দেখুন সোহরাব হাসান, 'দেখা ভোট, শোনা ভোট, না দেখা ভোট', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *ডেইলি স্টার*, 'ইরেগুলারিটিজ ওয়াশ আউট অপটিমিজম', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *ডেইলি স্টার*, 'অ্যাজ উই স', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *দৈনিক মানবজমিন*, 'সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বললেন আমার করার কিছু নেই', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *দৈনিক যুগান্তর*, 'সহিংসতায় নিহত ২১, প্রার্থীসহ আহত ৭শ': বিএনপির এজেন্টদের বের করে দেয়ার অভিযোগ, ১১ জনকে আটক, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, গুলি, বোমা বিস্ফোরণ, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

প্রায় প্রতিটি বেসরকারি চ্যানেলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নিয়ে 'টক শো' প্রচারিত হয়, যা ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি নির্বাচন-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু বিতর্কিত ভূমিকা লক্ষ করা যায়, যেমন বিভিন্ন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে প্রচারিত সংবাদ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন টক শো'র তথ্যে বস্তুনিষ্ঠতার ঘাটতি ইত্যাদি। নির্বাচনের আগে এবং পরে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ওপর সংবাদ প্রচারে কয়েকটি বেসরকারি চ্যানেল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে। প্রতিটি বেসরকারি চ্যানেলেই প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকার ওপর প্রতিবেদন ও সংবাদ এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করে। নির্বাচনের দিনে ভোট কেন্দ্র থেকে সরাসরি খবর সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় নির্বাচনী খবরের বস্তুনিষ্ঠতা অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

একজন বিশ্লেষকের মতে নির্বাচনের আসল চিত্র তুলে ধরতে দেশি সংবাদপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা প্রকটভাবে ধরা পড়েছে দুটো মাধ্যমে - ১. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারে; এবং ২. (ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ছাড়া) অন্যান্য বিদেশি সংবাদমাধ্যমে।[১৮৫] তাঁর মতে এই প্রবণতার কারণ হচ্ছে প্রথমত, সাংবাদিকদের একটি বড় অংশের দলীয় আনুগত্য, যার ফলে তাঁরা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস, দলীয় আনুগত্য বা বিশেষ বিশেষ রাজনীতিকের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নগুলোকে প্রাধান্য দেন বা দিতে বাধ্য হন; দ্বিতীয়ত, সংবাদ-মাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত থাকার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা তার খবরের ভোক্তার কাছে নয়, বরং রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী যাঁরা সেসব পৃষ্ঠপোষকের কাছে; এবং তৃতীয়ত, নানা ধরনের ভীতি ও চাপ।

৬.৮ উপসংহার

একাদশ জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ থাকলেও প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের ফলে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন ও সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক অবস্থান দৃশ্যমান ছিল। ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা সঠিক প্রতীয়মান হয়। ক্ষমতাসীন দলের শক্তিশালী প্রভাবের কারণে বিরোধী রাজনৈতিক দল, জোট ও প্রার্থী, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সংবাদ-মাধ্যম ও নাগরিক সমাজের একটি অংশ নির্বাচনে তাদের যথাযথ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে নি বলেও লক্ষ করা যায়। এছাড়া প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন, ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা ছিল বলে লক্ষ করা যায়।

---

[১৮৫] কামাল আহমেদ, 'সংবাদমাধ্যমের নির্বাচনী পরীক্ষা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ জানুয়ারি ২০১৯। তাঁর মতে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো সময় কাটিয়েছে স্টুডিওতে মুখচেনা আলোচকদের আলোচনায়, যাঁদের প্রধান কাজ ছিল বিরোধী দলের সমালোচনা। এজেন্টদের ভয় দেখিয়ে বাধা দেওয়া আর এজেন্ট দিতে না পারার ফারাকটা তাঁরা ক্রমাগত অস্বীকার করে গেছেন। এটি যে দলমত-নির্বিশেষে সরকারবিরোধী সবার ক্ষেত্রে হয়েছে, সেই তথ্যও তাঁরা উল্লেখ করতে পারেন নি। বিরোধীরা আক্রমণের শিকার হয়েছেন দেখার পরও বলা হয়েছে, হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর ক্ষমতাসীন দলের ভাষ্য পেলে তাকেই সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ফলে যত সহিংসতা হয়েছে তার সবটার দায় চাপানো হয়েছে বিরোধীদের ওপর।

অধ্যায় সাত

উপসংহার ও সুপারিশ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ তা পর্যালোচনা করা ছিল এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও প্রার্থী, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটুকু আইনানুগভাবে অনুসরণ করেছেন তা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ বিভিন্ন আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা ও কর্মতৎপরতার ওপর এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়, যেমন নির্বাচনী পরিবেশ নির্ভর করে। প্রাক-নির্বাচনী সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে নির্বাচন কমিশন তার নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে ভোটার তালিকা হালানাগাদ ও সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস সময়মতো সম্পন্ন করলেও সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রমাণ করতে সফল হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে নি, যেমন একদিকে বিরোধী দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও এবং ক্ষমতাসীন জোটের মতামত অনুযায়ী ইভিএম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের দাবি অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি, এবং অন্যদিকে তফসিল ঘোষণা, বা সবার জন্য সমান সুযোগ আছে বলে বিরোধিদলীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারকে সমর্থন করা। এছাড়া মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি ছিল, যার ফলে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে তৃণমূলের মতামত না নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই অনেক বিতর্ক থাকলেও নির্বাচন কমিশনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জোটের সংলাপ, ক্ষমতাসীন দলের সাথে প্রধান কয়েকটি দল নিয়ে গঠিত জাতীয় ঐক্যজোটের সংলাপ, এবং এর প্রভাবে প্রধান বিরোধী জোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের একচ্ছত্র আধিপত্য, প্রতিপক্ষ দলের নেতা-কর্মী, প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, প্রতিপক্ষের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় হামলা, বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া, বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনের দিন দলীয় প্রভাব খাটিয়ে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় জাল ভোট দেওয়া, বুথ দখল, আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরে রাখা, ভোট কেন্দ্রে ভোটার এবং প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ঢুকতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয়সমূহ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের বিশাল বিজয়ের পর নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়ম নিয়ে সব বিরোধী দল ও জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ-মাধ্যম, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অংশীদারের পক্ষ থেকে নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের দাবি উত্থাপন করা হয়। তবে এসব অভিযোগ নির্বাচন কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকেই বেশিরভাগ আসনে কোনো কোনো প্রার্থী প্রচারণা চালিয়েছেন বলে গবেষণায় দেখা যায়। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৪ জন প্রার্থী গড়ে ৭৪ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৮ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫০ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা, এবং আরেকটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২,৫০০ টাকা ব্যয় করেছেন বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭.৯% প্রার্থী। সার্বিকভাবে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) তিনগুণের বেশি। তবে প্রার্থীরা নির্ধারিত সীমার অনেক বেশি ব্যয় করলেও ব্যয়ের রিটার্নে তাঁরা সীমার মধ্যেই প্রচারণার ব্যয়ের হিসাব দেখিয়েছেন। প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা বা উদ্যোগ ছিল না।

একাদশ জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ থাকলেও প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের ফলে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন ও সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক অবস্থান দৃশ্যমান ছিল। ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা সঠিক প্রতীয়মান হয়। ক্ষমতাসীন দলের শক্তিশালী প্রভাবের কারণে বিরোধী

রাজনৈতিক দল, জোট ও প্রার্থী, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সংবাদ-মাধ্যম ও নাগরিক সমাজের একটি অংশ নির্বাচনে তাদের যথাযথ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে নি বলেও লক্ষ করা যায়। এছাড়া প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন, ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা ছিল বলে লক্ষ করা যায়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' বলা গেলেও তা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' হতে পারে নি।

সুপারিশ

একটি নির্বাচনকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য শুধুমাত্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকাই যথেষ্ট নয়, এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, পর্যবেক্ষক এবং সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকাও অপরিহার্য। টিআইবি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচনে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করেছে তা বন্ধ করতে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করছে।

১. সৎ, যোগ্য, সাহসী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
২. দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হতে হবে।
৩. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগসহ নির্বাচনী আচরণ বিধির বহুমুখী লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ও তার ওপর ভিত্তি করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৪. আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে তাদের ব্যর্থতা নিরূপণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্যোগ নিতে হবে।
৫. নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (ভোটার তালিকা হালনাগাদ, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র উত্তোলন ও জমা, প্রার্থীর আর্থিক তথ্য যাচাই, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি) ডিজিটালাইজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও গণ-মাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, ২০০৭, *নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ*, টিআইবি, ঢাকা।

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, ২০১০, *নবম সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা*, টিআইবি, ঢাকা।

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, ২০১৪, *কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*, টিআইবি, ঢাকা।

বদিউল আলম মজুমদার, ২০০৮, (সম্পাদিত) *সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন*, সুজন - সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঢাকা।

ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম, ২০১৮, *একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮: নিবাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন*, ঢাকা।

Human Rights Watch, 2018, *"Creating Panic": Bangladesh Election Crackdown on Political Opponents and Critics*, US. http://www.hrw.org

The House of Commons Library, 2018, *Bangladesh: November, 2018 update*, Briefing Paper, Number 8448, 29 November 2018. www.parliament.uk/commons-library

United States Department of State, *Bangladesh 2018 Human Rights Report*, Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.

পরিশিষ্ট ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে উল্লেখযোগ্য আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন		আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
১.	জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি)	৯৫.১	৮৭.৫	৩০.৬	৪০	৫৭.১	৫৮.৮৮
২.	দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	৮০.৫	৭৫	৪৪.৪	৪০	৫৭.১	৫৭.০১
৩.	নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারকে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান	৭০.৭	৭৫	৪৪.৪	২০	৪২.৯	৫১.৪০
৪.	পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৬৩.৪	৫০	৪৭.২	২০	৪২.৯	৪৭.৬৬
৫.	প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক ক্যাম্প/অফিস স্থাপন	৮২.৯	৫০	১৯.৪	২০	২৮.৬	৪৪.৮৬
৬.	ভোটের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	৬৫.৯	২৫	২৭.৮	৪০	৫৭.১	৪২.০৬
৭.	মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	৬৩.৪	২৫	৩০.৬	২০	২৮.৬	৩৯.২৫
৮.	'দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা'র বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	৬৩.৪	৬২.৫	২২.২	০	২৮.৬	৩৮.৩২
৯.	মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শো-ডাউন	৬১	২৫	২৭.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮
১০.	প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা	৭৮	৫০	২.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮
১১.	প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি/ চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৬১	৩৭.৫	১৩.৯	০	২৮.৬	৩২.৭১
১২.	৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	৫৬.১	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	৩১.৭৮
১৩.	গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	৬৫.৯	১২.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৯.৯১
১৪.	যেকোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	৪৩.৯	৩৭.৫	১৬.৭	০	৫৭.১	২৮.৯৭
১৫.	পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি	৪৮.৮	৬২.৫	৫.৬	০	২৮.৬	২৭.১০
১৬.	দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনী প্রতীক	৫৮.৫	৩৭.৫	০	০	২৮.৬	২৭.১০
১৭.	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট ইত্যাদির ওপর অন্য প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট লাগানো এবং কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন	৪১.৫	৫০	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৭.১০
১৮.	ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৫৩.৭	৩৭.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৭.১০
১৯.	ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উস্কানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দান	৩৯	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৫.২৩
২০.	অনভিপ্রেত গোলোযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা শান্তি ভঙ্গ	৪৮.৮	২৫	৫.৬	২০	২৮.৬	২৫.২৩
২১.	প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৫৩.৭	২৫	৮.৩	০	০	২৫.২৩
২২.	প্রার্থীর নিজের ছবি ও প্রতীক ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতীক বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার	২৯.৩	৭৫	১৬.৭	০	০	২২.৪৩

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ধরন	আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
২৩. নির্বাচনের আগে কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার	২২	২৫	৫.৬	০	২৮.৬	১৪.০২
২৪. রঙিন পোস্টার ছাপা ও টাঙানো	১৯.৫	১২.৫	২.৮	০	০	৯.৩৫
২৫. পোস্টারের আয়তন ২৩" X ১৮" এর বেশি	১৪.৬	১২.৫	৫.৬	০	০	৮.৪১
২৬. দেওয়ালে লিখে বা অংকন করে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	১২.২	১২.৫	০	০	২৮.৬	৭.৪৮
২৭. সড়ক বা জনগণের চলাচলের স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন	১২.২	২৫	০	০	০	৬.৫৪
২৮. নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, অনুদান ছাড়করণ	৭.৩	১২.৫	০	০	১৪.৩	৪.৬৭
২৯. পোস্টারে কোনো অনুষ্ঠান বা মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিতে ছাপানো	৭.৩	১২.৫	২.৮	০	০	৪.৬৭
৩০. দল বা প্রার্থী কর্তৃক সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার	৭.৩	০	০	০	০	২.৮০
৩১. প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার	৪.৯	০	০	০	০	১.৮৭

পরিশিষ্ট ২: পেশা অনুযায়ী ব্যয় (টাকা)

পেশা	প্রার্থীর সংখ্যা	গড় ব্যয়	সর্বনিম্ন ব্যয়	সর্বোচ্চ ব্যয়
ব্যবসায়ী	৫৭	৮০,১১,৬৪৩	৪৭,৫০০	৪,০৫,৭৫,৫০০
আইনজীবী	১৪	৪৮,৭৬,১৭৫	৫,৬২,০০০	১,৮০,০৫,৫০০
কৃষিজীবী	২	১,৬৭,১৯,৯০০	৪,০৩,৮০০	৩,৩০,৩৬,০০০
শিক্ষক	৭	৩৮,৬৬,০৪৩	৬,৭০,৩০০	১,৭৪,২৮,০০০
চিকিৎসক	৬	৮১,২৮,২২৩	২৬,৯৮,০০০	১,৮৯,৬১,৫০০
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা	৩	৪৪,৮৯,০৩৩	৫,৭৪,০০০	১,০৬,৬৬,৫০০
শিল্পপতি	২	৫৪,২৯,৭৫০	৪৮,৫৮,৫০০	৬০,০১,০০০
গৃহকর্ম	২	৭,৫৫,৪৬৮	৩,২৭,৭০০	১১,৮৩,২৩৫
অন্যান্য	১৪	১,২২,০১,৭৮৮	২,৭৬,৫০০	৪,৫৫,৬৯,৫০০

পরিশিষ্ট ৩: প্রচারণার ধরন অনুযায়ী প্রার্থীদের প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়

ব্যয়ের খাত	মোট প্রার্থী	গড় ব্যয় (টাকা)
পোস্টার	১০১	৬,০১,৭৯৫
ব্যানার/ফেস্টুন	৭৫	১,৯১,০০৪
দেওয়াল লিখন	৫	১০,৪০০
র‍্যালি /মিছিল	৫৬	৭,৭১,৬৪৩
নির্বাচনী প্রতীক তৈরি ও প্রদর্শন	৫৫	১,২৯,৮৭১
জনসভা	৭২	১৩,৯০,৪৬৮
মাইকিং	৯২	৩,৮৭,৫০৪
তোরণ	৩৩	৭৭,৩২৯
জনসংযোগ	৭৭	৬,৭৯,৩২৯
যাতায়াত/পরিবহন ব্যয়	৮৫	৩,১০,৩৫৩
কর্মীদের জন্য ব্যয়	৮৮	২৮,৫২,৯৪২
নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা	৭৯	২০,৯৫,০১৪
কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা (ধর্মীয়, ক্লাব ইত্যাদি)	১১	১,৯৩,১৮২
গেঞ্জি/টিশার্ট/টুপি	২৫	৪,৭০,৭০০
মিডিয়া/ভিডিও	২০	৫৯,৪০০
নির্বাচন কমিশন ফি	১০৭	৩৪,০৩৬
দলীয় মনোনয়ন ফি	১০৩	২৮,২৩৩
অন্যান্য	৮৭	৬,০৭,৬৮০

পরিশিষ্ট ৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের চিত্র

সিরাজউদ্দিন মেমোরিয়াল কলেজকে সরকারিকরণ করায়
শেখ হাসিনা

নাসিমা ফেরদৌসী এম.পি

জয় বাংলা
আল্লাহ সর্বশক্তিমান
জয় বঙ্গবন্ধু
শেখ হাসিনার সালাম নিন
১২ অক্টোবর ২০১৮
জাতীয় শ্রমিকলীগের
৪৯ তম
নৌকায় ভোট দিন
সফল হোক স্বার্থক হোক
সৌজন্যেঃ মোহাম্মদ আলী সরদার